সেবা রোমান্টিক

মধুযামিনী

শেখ আব্দুল হাকিম

সেবা রোমান্টিক ৪৯

মধুযামিনী

শেখ আবদুল হাকিম

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 - 16 - 0138 - 9

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক :
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

MODHUJAMINEE
By: Sheikh Abdul Hakim

তেইশ টাকা

এক

এ এক বিপজ্জনক খেলা। প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ে যাবার ভয়। তবে ফিউরির নার্ভ ইস্পাতের মত শক্ত, যে-কোন বিপদে ঠাণ্ডা রাখতে পারে মাথা। পরম বন্ধু উপস্থিত বুদ্ধি।

নিউ মার্কেটের দক্ষিণ গেটের পাশে একটা লাল সুবারুর ভেতর বসে আছে ফিউরি; বাম হাতটা তুলে দিয়েছে জানালার ফ্রেমে, আঙুলে সোনার আঙটি আর কব্জিতে দামী রিস্টওয়াচ, ডান হাতে বেনসন অ্যাণ্ড হেজেসের প্যাকেট ও লাইটার। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, দেখে মনে হবে কারও জন্যে অপেক্ষা করছে। আসলে শিকার ধরার আশায় বসে আছে সে। মনে মনে ভাবছে, আজও কি হতাশ হতে হবে তাকে? চট্টগ্রাম থেকে এবার ঢাকায় আসার পর দু'মাস গত হতে চলেছে, ফাঁদে ফেলা যায় এমন একটা শিকারও তার চোখে পড়েনি। অথচ গত বছর এ-সময় ঢাকায় এসে ভালই কামিয়েছিল।

তাকে প্রায় চমকে দিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল সাদা একটা করোলা। প্রৌঢ় ড্রাইভার তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মত নিচে নেমে প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলে দিল, চীনাদের মত সবিনয়ে নত করল মাথা। ইতিমধ্যে একটা ইংরেজি দৈনিকের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে ফিউরি, পত্রিকা পড়ার ছলে লক্ষ করছে একমাত্র আরোহিণীকে। এ পেশার প্রথম নিয়ম, তুমি যে নজর রাখছ সম্ভাব্য শিকারকে তা বুঝতে দেয়া চলবে না।

প্লাক করা ভুরু, তিল ভরা মুখের তামাটে চামড়া ঢাকার জন্যে পুরু করে লেপা হয়েছে রুজ, চোখের পাতায় মাসকারা, মাথার চুল ভাগ করে ছোট বড় তিনটে খোঁপা বানানো হয়েছে, বয়েস হবে ত্রিশ বা খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ। কানের রিঙ দুটো এত বড় যে বালা হিসেবে হাতেও বোধহয় পরা যাবে। এক হাতে ছ'টা সোনার চুড়ি, অপর হাতে সোনালি চেইন সহ হাতঘড়ি, গলায় ভরি তিনেক ওজনের নেকলেস।

ফিউরি ভাবল, ছিনতাইকারী বন্ধুরা···তোমরা কোথায়!

ওড়নাটা গলায় উঠে যাওয়া উচিত হয়নি, কারণ বুকটা আকারেই শুধু বিশাল, সূচনা বা বিভক্তি রেখার কোন হদিসই খুঁজে পেল না ফিউরি। শরীরে এত বেশি চর্বি, শুধু আপত্তিকর নয়, মহিলাকে রীতিমত বেহায়া লাগল তার। এ-ধরনের বেঢপ আকৃতিও পোশাকের গুণে কদর্যতা ঢাকতে পারে, যদিও এই মহিলার ক্ষেত্রে আঁটসাঁট ও খানিকটা খাটো সালোয়ার-কামিজ তা আরও উৎকট করে তুলেছে। গাড়িতে তালা লাগিয়ে পথ দেখাল ড্রাইভার, তার পিছু নিয়ে গেটের দিকে এগোল মহিলা, শরীরে আড়মোড়া ভাঙছে বিপুল মেদ। ফিউরির মনে হলো, এ-ধরনের অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আইন থাকা দরকার।

কাম অন, ফিউরি! নিজেকে সামান্য তিরস্কার করল সে। তুমি খুব ভাল করেই জানো কোথায় বাস করছ। রাষ্ট্র যেখানে তার কোটি কোটি নাগরিককে দু'বেলা খেতে দিতে ব্যর্থ হয়, সেখানে তুমি সুরুচির নিশ্চয়তা পাবার জন্যে আইনের সহায়তা চাও কি করে? তোমার দেশের রাজনীতি বলো অর্থনীতি বলো সবই সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে, তার বিরুদ্ধে কোন আইন আছে কি?

মহিলার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না ফিউরি, তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। মেজাজ খারাপ হবার কারণ অবশ্য এই নয় যে তার শিকার হবার যোগ্যতা মহিলার নেই। একবার চোখ বুলালেই

মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে যায় সে। এক্ষেত্রে তার ধারণা হয়েছে, এই মহিলাকে ফাঁদে ফেলা অসম্ভব নাও হতে পারে। প্রথমে আসলে সমস্ত দিক বিবেচনায় রেখে শিকারকে মনে ধরতে হয়, তারপর শুরু করতে হয় তদন্ত ও অনুসন্ধান। শিকারের স্বভাব-চরিত্র, সামাজিক অবস্থান, পারিবারিক পরিবেশ, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পরই শুধু বোঝা যায় তাকে ফাঁদে ফেলা সম্ভব কিনা। মেজাজ খারাপ হবার কারণ হলো, এ-ধরনের শিকারের প্রতি তার মনে একটা বিতৃষ্ণা জন্মেছে। এর আগের দুটো শিকার—একটা সিলেটে, অপরটি চট্টগ্রামে—এই শ্রেণীরই ছিল। দুটো ক্ষেত্রেই তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তার। অবৈধ প্রেমিক হিসেবে ফিউরিকে স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিল একজন, তার দৈহিক চাহিদা মেটানোর শর্তে। অতি কষ্টে তার কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচেছে সে। অপর মহিলা ধরে নেয় ফিউরি যেহেতু তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, নিয়মিত দামী দামী প্রেজেন্টেশন দাবি করার অধিকার তার ষোলো আনা। এখান থেকেও লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে তাকে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ-ধরনের শিকার তার দরকার নেই।

আরেকটা গাড়ি এসে থামল। ফিউরি ভাবল, নিউ মার্কেট কি শেষ পর্যন্ত মেদ প্রদর্শনের জায়গা হয়ে উঠল? গাড়ি থেকে নামতে দেখে সদ্য আগত মহিলা সম্পর্কেও তার ধারণা হলো, এ-ও সম্ভবত কোন ঘুষখোর আমলা অথবা অসৎ কোন ব্যবসায়ীর স্ত্রী হবে—সারাদিন নিশ্চয়ই শুধু খায় আর ঘুমায়, যতক্ষণ জেগে থাকে চাকরবাকরদের জীবন নরক করে তোলে।

খানিকটা দূরে একটা বেবীট্যাক্সি এসে থামল। এক রঙা সিল্ক দেখেই ফিউরি ধরে নিল ওটা সালোয়ার, মাথা খানিকটা উঁচু করতে সিল্ক মোড়া সুগঠিত হাঁটুও দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সে। সে-ও নামল, বেবীট্যাক্সি থেকে মেয়েটাও নামল। দেখেই বুকটা ধক্ করে

উঠল তার। নিষ্পাপ একটা কচি মুখ। মিষ্টি লজ্জাটে হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটে। আবেগে থরথর করা একটা ভাব আছে মেয়েটার মধ্যে, বিশ গজ দূর থেকেও উপলব্ধি করতে পারছে সে। এরকম সরল আর কোমল মেয়েই দরকার তার। সহজেই যাকে মুগ্ধ করা যায়।

মেয়েটা তাকিয়ে আছে বেবীট্যাক্সির ভেতর, ওখানে কেউ একজন আছে। ড্রাইভারকে দেখতে পাচ্ছে ফিউরি, পিছন ফিরে আরোহীর কাছ থেকে ভাড়া নিচ্ছে। টাকা দিয়ে নিচে নামল আরোহী। সুদর্শন এক তরুণ। নামল, কিন্তু গেটের দিকে এগোল না, ড্রাইভারের কাছ থেকে অবশিষ্ট টাকা নেয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। ফিউরি লক্ষ করল, কোনদিকে খেয়াল নেই তরুণীর, সব ভুলে তাকিয়ে আছে তরুণের দিকে। মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। এ মেয়েকে ফাঁদে ফেলা সম্ভব নয়, কারণ অন্য একটা ফাঁদে আগেই আটকা পড়েছে। তার চোখই বলে দিচ্ছে, নিজের সমস্ত প্রেম আর গোটা অস্তিত্ব তরুণকে উৎসর্গ করেছে সে। সম্ভাব্য শিকারের তালিকা থেকে মেয়েটা বাদ পড়লেও, তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না ফিউরি। লক্ষ করল, লাজুক একটা ভাব ছেলেটার মধ্যেও রয়েছে, সে-ও ড্রাইভারের বাড়ানো হাত থেকে ভাঙতি টাকা নেয়ার সময় মেয়েটার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারল না।

চেহারা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল ফিউরির, কেউ যেন তার পেটে ঘুসি মেরেছে। কাউকে প্রেম করতে দেখলে প্রথমে একটা মুগ্ধ বিস্ময় গ্রাস করে তাকে, তারপরই তীব্র ব্যথায় কুঁকড়ে যায় তার অন্তর, মনে পড়ে যায় নিজের অতীত।

বেনসনের প্যাকেট খুলে ভেতরে তাকায় সে। প্যাকেটের ভেতর সব সময় তিনটে বেনসন থাকে, বাকিগুলো সস্তাদরের স্টার। পাঁচ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে ঢাকায় এসেছে, প্রায় শেষও হয়ে এসেছে সেটা, কাজেই পাইটি পয়সা হিসেব করে খরচ করতে হয় তাকে। কিন্তু পুরানো

আক্রোশটা মাথাচাড়া দিলে বেপরোয়া একটা ভাব চলে আসে তার মধ্যে, ভবিষ্যতের কথা ভুলে গিয়ে বিলাসিতায় ডুব দিতে ইচ্ছে করে। একটা বেনসনই ধরায় সে।

সিগারেটে টান দিয়ে সিদ্ধান্তটা পাল্টাবে কিনা চিন্তা করে ফিউরি। ধনী লোকদের স্ত্রীকে ফাঁদে ফেলা অত্যন্ত কঠিন হলেও, একবার ফাঁদে ফেলতে পারলে টাকা খসানো সহজ। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের কাছে টাকা থাকে। আর অবিবাহিতা মেয়েরা সহজ শিকার হলেও তাদের কাছে টাকা খুব কমই থাকে। সিলেট আর চট্টগ্রাম ঠকেছে বটে, তবে ঢাকায় যাদেরকে পটিয়ে টাকা কামিয়েছে তারা সবাই ছিল বিবাহিতা। শিকার বিবাহিতা হলে আরও একটা সুবিধে হলো, বিয়ের প্রসঙ্গটা ওঠে না। সুবিধে আরও অনেক আছে। যেহেতু দু'জনের সম্পর্কটা দাঁড়ায় অবৈধ, তার ব্যাপারে সবার কাছে সবকিছু গোপন রাখতে চায় শিকার। অর্থাৎ নিজের পরিচয় ও অন্যান্য তথ্য গোপন রাখার ব্যাপারে শিকারের কাছ থেকে সব রকম সাহায্য পায় সে। কিন্তু শিকার যদি অবিবাহিতা হয়, দুনিয়ার মানুষকে বলে বেড়ায় কার সঙ্গে প্রেমে পড়েছে সে। শুধু কি তাই, তার দেয়া পরিচয় সত্যি কিনা জানার জন্যে ফুফাতো-মামাতো ভাইদের লাগিয়ে দেয়! তারপর বাপ-চাচারা খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। অনেক সময় সরাসরি জেরা করা হয়। অর্থাৎ তার ধরা পড়ার আশঙ্কা বিপুল হারে বেড়ে যায়। শিকার হিসেবে কুমারী মেয়েকে বেছে নিলে আরও অনেক অসুবিধে আছে। মেয়েগুলোর বাবা-মা আজকাল এমন চালাক হয়ে গেছেন, মেয়ে কারও সঙ্গে প্রেম করছে জানতে পারলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন, ধরে নেন বিয়েতে তাঁদেরকে কোন খরচ করতে হবে না। বোধহয় সেজন্যেই বেশিরভাগ বাবা-মা মেয়ের প্রেম অনুমোদন করেন না, কারণ অনুমোদন করলেই বিয়েটা হবে আয়োজিত ও আনুষ্ঠানিক, সেক্ষেত্রে খরচ বাঁচানোর কোন সুযোগ থাকবে না। তাঁরা বোধহয় মনে মনে চান, অনুমতি

ছাড়াই মেয়ে তার ভালবাসার পাত্রকে বিয়ে করে তাঁদের খরচ বাঁচিয়ে দিক। এদিক থেকে মেয়েরাও কম যায় না—তাদের কথা হলো, ভালই যদি বাসো, বিনা যৌতক বিয়ে করো।

এ-ধরনের বিয়েও ইতিমধ্যে তিনটে করেছে ফিউরি, তবে সবগুলোই যৌতক নিয়ে। একটা চট্টগ্রামে, একটা সিলেটে, একটা খুলনায়। তবে প্রতারক হলেও ফিউরির একটা নীতি আছে। বিয়েই করেছে সে, কোন মেয়েকে নষ্ট করেনি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফুলশয্যার রাতেই যতটা সম্ভব হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়েছে। কেটে না পড়ে অন্তত কিছুদিন ঘর-সংসার করলে লাভের পরিমাণ আরও বেশি হত তার, নিজের খাওয়া-পরার চিন্তা তো থাকতই না, নানান ছুতো দেখিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে আরও কিছু আদায় করা যেত। কিন্তু না, অল্পেই সন্তুষ্ট থেকেছে সে, বেশি লোভ করতে যায়নি। সব মানুষেরই অন্যায় করার একটা সীমা আছে, যতটুকু তার ধাতে সয় বা যতটুকু ভার সে বইতে পারে। দর্শন আর ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা খুব একটা কম নয় ফিউরির, একটা সময় ছিল এ-সব নিয়ে প্রচুর মাথাও ঘামিয়েছে। পাঁচজন লোক একই অন্যায় করে একই রকম শাস্তি পায়, এরকমটি কখনও হতে দেখেনি সে। তারমানে বোধহয় এ-সব করার সীমা এক একজনের বেলায় এক এক রকম। মাঝে মাঝে ফিউরির এ-কথাও মনে হয়েছে যে কিছু মানুষকে বোধহয় সীমা ছাড়ানো অন্যায় বা পাপ করার অনুমতিও দেয়া হয়, অর্থাৎ তাদেরকে ভুগতে হয় না। এর মধ্যে বোধহয় অনুমতি আদায় করে নিতে পারারও একটা ব্যাপার থাকে। আবার, কিছু লোককে সামান্যতম পাপ করারও অনুমতি দেয়া হয় না। ঈশ্বর নিরপেক্ষ নন, এর ভূরি ভূরি প্রমাণ চোখের সামনেই তো ছড়িয়ে রয়েছে। কিংবা প্রশ্নটা হয়তো নিরপেক্ষতার নয়, খেয়ালের। তাঁর এই অদ্ভুত খেয়ালের ভেতর একটা ছক থাকলেও থাকতে পারে, যার রহস্য আজও মানুষ ভেদ করতে পারেনি।

ফিউরি যে এভাবে হিসেব কষে নিজেকে সীমার ভেতর বেঁধে রাখে, তা নয়। অনেক বড় অন্যায়কে ছোট করে দেখে সে, আবার অনেক ছোট অন্যায়কে বড় করে। দায়ী আসলে তার শিক্ষা আর রুচি। আটাশ বছরের স্বাস্থ্যবান পুরুষ, নারীর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ তো তার ভেতর থাকবেই, অথচ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোন মেয়ের সঙ্গে শোয়নি সে। যে মেয়ের সঙ্গে সংসার পাতবে না তার সতীত্ব হরণ করতে মন চায়নি তার। সেজন্যেই প্রতিবার ফুলশয্যার রাতে পালাতে হয়েছে তাকে। শুধু তাই নয়, সংযম রক্ষার আরও অনেক কঠিন ও অবিশ্বাস্য পরীক্ষা তাকে দিতে হয়।

প্রতারণায় প্রথম তার হাতে-খড়ি সাত বছর আগে খুলনায়।

তানজিন তার জীবন থেকে হারিয়ে যাবার পর উদভ্রান্ত ফিউরি তখন এক শহর থেকে আরেক শহরে উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুলনায় এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিল, দু'জন আরা একই সাবজেক্টে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স পাস করেছে। রাহাত ইতিমধ্যে এম. এ. পাস করে ভাল একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে, কিন্তু গ্রামের বাড়িতে বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ায় লেখাপড়া ছাড়তে হয়েছে ফিউরিকে।

সিলেটের ছেলে সে, বাবা মারা যাবার পর ওখানে চাকরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, চলে আসে চট্টগ্রামে। ভেবেছিল বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্য নিয়ে ছোটখাট একটা চাকরি ঠিকই যোগাড় করে নিতে পারবে সে। কিন্তু না, আরও এক দেড় কোটি শিক্ষিত তরুণের মত বেকারত্বের অভিশাপ তাকেও ছাড়েনি। গ্রামে একা শুধু মা আছে, ভিটে ছাড়া জমি প্রায় নেই বললেই চলে, ছেলে টাকা পাঠালে তবে তার খাওয়া-পরা চলবে। অগত্যা টিউশনি ধরে ফিউরি। পাঁচ-সাতটা বাড়িতে ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে আয় হত সামান্যই, তবু তা থেকেই নিয়মিত টাকা পাঠাত মাকে। অত্যন্ত ক্লান্তিকর আর নিষ্প্রভ সময় কাটছিল ফিউরির। টাকার অভাবে লেখাপড়া শেষ

করতে পারেনি বটে, কিন্তু ইংরেজি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছেলে সে। লম্বা-চওড়া কাঠামো, সুদর্শন চেহারা, আচরণে অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ভদ্রোচিত একটা চাকরি যোগাড় করতে পারছিল না। এক সরকারী অফিস থেকে বলা হলো, ইন্টারভিউ খারাপ হোক ভাল হোক কিছু আসে যায় না, ত্রিশ হাজার টাকা খরচা করতে না পারলে তার কোন আশা নেই। একটা ব্যাংকে চাকরি প্রায় হয়ে গিয়েছিল, ইন্টারভিউয়ে সবচেয়ে বেশি নম্বর পায় ফিউরি। ব্যাংক ম্যানেজার লোক পাঠিয়ে প্রস্তাব দিল তার মেয়েকে বিয়ে করলে চাকরিটা ওকেই দেয়া হবে। শুধু চাকরি না, যৌতক হিসেবেও অনেক কিছু পাবে সে। ম্যানেজারের লোক আগেই সাবধান করে দিল, মেয়েটার একবার বিয়ে হয়েছিল, সে বোবা।

দিনে দিনে হতাশা ও ক্ষোভ জমা হচ্ছিল ফিউরির মনে। তার দৈন্য অবস্থা দেখে পুরানো বন্ধুরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যাদের সঙ্গে বসে আড্ডা দিয়েছে মাসের পর মাস, কোথাও দেখা হলে চিনতে না পারার ভান করে তারা। অপমানিত বোধ করে ফিউরি, ব্যর্থতার জ্বালা সহ্য করতে কষ্ট হয় তার। তারপরও তার জীবনে আনন্দ ছিল, ছিল সুস্থ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা। সেই আনন্দ আর প্রেরণার উৎস ছিল তানজিন।

একটানা তিনবছর তাকে পড়িয়েছে ফিউরি। ছাত্রী হিসেবে স্কুলে মোটেও ভাল ছিল না সে, তবে ফিউরির কাছে এক বছর পড়ে ম্যাট্রিকে প্রথম বিভাগ পায়। তানজিন নিজে, তার মা-বাবাও, রেজাল্ট দেখে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে, কৃতিত্বটা ফিউরিরই। যেদিন রেজাল্ট বেরুল সেদিনই প্রথম জানা গেল ফিউরিকে মনে মনে ভালবাসে তানজিন। ঘরে কেউ নেই, একটা প্লেটে কয়েকটা মিষ্টি এনে সামনে দাঁড়াল তানজিন, বলল, 'হাঁ করুন, আজ আমি আপনাকে নিজের হাতে মিষ্টি খাওয়াব।'

তার কথা শুনে শুধু অবাক নয়, রাগও হয় ফিউরির। তানজিন সুন্দরী, কিন্তু ছাত্রী বলেই তার দিকে অন্যরকম দৃষ্টিতে কোনদিন তাকায়নি সে।

এরকম একটা খুশির দিনে মেয়েটাকে ধমক দিতে ইচ্ছে করেনি ফিউরির। সে ধরে নেয়, তানজিন ছেলেমানুষি করছে, ব্যাপারটার মধ্যে অন্য কিছু নেই। কাজেই হাঁ করে সে, তানজিন নিজের হাতে তাকে মিষ্টি খাওয়ায়।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলে সব দিক থেকে ভাল হত। কিন্তু না, তানজিনের অন্যরকম উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয় মিষ্টিটা বাড়িয়ে দেয় সে, ফিউরি মুখও খোলে। এসময় খিল খিল করে হেসে ওঠে তানজিন, বলে, 'উঁহুঁ, মুখে নয়, হাতে নিন।'

সামান্য অপ্রতিভ বোধ করে ফিউরি, তানজিনের হাত থেকে মিষ্টিটা নেয়।

'এবার আপনি আমাকে খাওয়ান,' বলে নিজেই হাঁ করে তানজিন।

সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে যায় ফিউরি, বলে, 'এ কি ধরনের বেয়াদপি!' মিষ্টিটা তানজিনের হাতে ধরা প্লেটে রেখে দেয় সে।

হতভম্ব হয়ে ফিউরির দিকে তাকিয়ে থাকে তানজিন। তার চোখ দুটো পানিতে ভরে ওঠে। অস্থির হয়ে ওঠে ফিউরি, কি বলবে বুঝতে পারে না। চোখে পানি নিয়েই তানজিন জিজ্ঞেস করে, 'আপনার ওপর আমার কি কোন দাবি নেই?'

'কী আশ্চর্য, এ প্রশ্ন···।'

ফিউরিকে থামিয়ে দিয়ে তানজিন বলে, 'আপনাকে আমি···আমি আপনাকে···আপনি বুঝতে পারেন না?' বলে আর দাঁড়ায়নি সে, এক ছুটে বেরিয়ে যায় কামরা থেকে।

এরপর নিজের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে ফিউরি। এক হপ্তা কেটে গেল, তারপর দু'হপ্তা, কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। তানজিনের মা লোক মারফত খবর পাঠিয়েছেন, অসুস্থতার অজুহাতে যাচ্ছে না সে। তার বিবেক বলছে, তানজিন তার ছাত্রী, ওকে তার ভালবাসা উচিত নয়। তাছাড়া, ভালবাসার পরিণতি যখন বিয়েই, সেটা সম্ভব কিনা তাও তো

ভেবে দেখতে হবে। তানজিন বিরাট ধনী ব্যবসায়ীর মেয়ে, তার অন্যান্য বোনদের বিয়ে হয়েছে কোটিপতি ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই। তানজিনের মা-বাবা তাকে জামাই করতে অবশ্যই রাজি হবেন না। ফিউরি প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তানজিনকে আর পড়াবে না, এই সময় কয়েকটা মেয়ে এল ওর মেসে। সবাইকে চেনে সে, তানজিনের সঙ্গেই ম্যাট্রিক পাস করেছে তারা। অনেকগুলো মেয়ে এক জায়গায় জড়ো হলে, হোক তারা অনভিজ্ঞ বা অল্পবয়েসী, দ্বিধা আর সংকোচ খুব সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারে। তারা রীতিমত আবদার আর দাবি জানিয়ে বলতে শুরু করল, তানজিনের ভালবাসাকে মর্যাদা দিতে হবে। জানা গেল, ফিউরিকে প্রথম দিন দেখেই নাকি ভালবেসে ফেলেছে তানজিন। এখন তাকে প্রত্যাখ্যান করা হলে বিষ খেয়ে মরবে সে। ইত্যাদি আরও অনেক কথা। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে কথা দিতে বাধ্য হলো, তানজিনের সঙ্গে দেখা করবে ফিউরি।

দেখা করার পর ফিউরি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলো, মেয়েটা সত্যি তাকে ভালবাসে। একদিনে বা এক মাসে নয়, ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ল সে। প্রথমে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তানজিনের ভালবাসায় সাড়া দিল, কিন্তু ছ'মাসের মাথায় উপলব্ধি করল, সে-ও তানজিনকে অসম্ভব ভালবেসে ফেলেছে।

পরবর্তী দু'বছর দু'জনের প্রেম আরও শুধু গাঢ়ই হয়েছে। একটা দিন ফিউরিকে দেখতে না পেলে অস্থির হয়ে ওঠে তানজিন। হপ্তায় ছ'টা দিন পড়াবার সময় তো দেখা হয়ই, ছুটির দিনগুলোতেও নিউ মার্কেটে বা সিনেমা হলে অথবা পার্কে মিলিত হয় ওরা। ইতিমধ্যে নিজের আর্থিক অবস্থা ও ব্যর্থতার কথা সবই তানজিনকে জানিয়েছে ফিউরি। সব সমস্যার সহজ সমাধান আবিষ্কার করার ব্যাপারে তানজিনের জুড়ি নেই। ফিউরিকে অভয় দিয়ে সে জানিয়েছে, ভাই-বোনদের মধ্যে সবার ছোট সে, কাজেই তার আবদার গুরুজনরা ফেলতে পারবেন না। তাছাড়া,

বিশেষ করে তার বাবা তাকে সব রকম স্বাধীনতা দিয়েছেন, এমনকি কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই বলেন যে তানজিন যদি কোন ছেলেকে পছন্দ করে, ছেলেটা যদি ভাল হয়, তাকে জামাই করতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। ফিউরির চাকরি নেই তো কি হয়েছে, বিয়ের পর তানজিনের বাবাই কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন।

এ-সব যে তানজিনের ছেলেমানুষি চিন্তা, ফিউরি তা বোঝে। সেজন্যেই ভাল একটা চাকরির জন্যে উঠেপড়ে লাগে সে। তাতে তানজিনেরও সমর্থন থাকে। ইতিমধ্যে সে-ও বুঝেছে যে ওদের সম্পর্কের কথা গুরুজনদের জানাবার আগে ফিউরির একটা রোজগারের উৎস থাকা দরকার।

তারপর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিল তানজিন। প্রায় এক বছর পর মাকে দেখার জন্যে ক'দিনের জন্যে সিলেটে চলে এল ফিউরি। তেরো দিন পর চট্টগ্রামে ফিরল সে, ফিরতেই যেন তার মাথায় বাজ পড়ল। সাতদিন আগে বাবা-মার নির্বাচিত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে তানজিনের। বিয়ের আগের দিন লেখা তার একটা চিঠি পেল ফিউরি, তানজিনের এক বান্ধবী চিঠিটা ফিউরির মেসে এক লোকের হাতে দিয়ে গেছে। চিঠিতে তানজিন লিখেছে :

'গুরুজনরা বোঝাবার পর আমিও উপলব্ধি করেছি, বাঙালী মেয়েদের আসল প্রেম শুরু হয় স্বামীর সঙ্গে। আর স্বামীকে শ্রদ্ধা করা যায় ভালবাসা দেয়া যায় যদি তার কৃতিত্বের পরিমাণ যথেষ্ট হয়। আমি জানি জীবন সংগ্রামে আপনিও জয়ী হবেন, যার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে সে-ও আপনাকে ভালবাসবে ও শ্রদ্ধা করবে। আপনার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আজ এখানেই ছিন্ন হলো, কারণ সেটা ছিল অপরিণত ও অবাস্তব, কিন্তু আমি চাই দ্বিতীয় সম্পর্কটা চিরকাল অটুট থাকুক। শিক্ষক হিসেবে আপনি আমার

আদর্শ, আপনার অবদান কখনও আমি ভুলব না। সিলেট থেকে কবে আপনি ফিরবেন জানি না, ফিরে হয়তো দেখবেন স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় চলে গেছি আমি। বাড়িতে একবার এলেই হবে, কাউকে কিছু বলতে হবে না, মা আপনাকে গত মাসের বেতনটা দিয়ে দেবেন। আমার জন্যে দোয়া করবেন। আমিও দোয়া করি আপনি যেন সুখী হন।

তানজিন।'

চিঠিটা পেয়েছিল সন্ধের দিকে। ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে ছিল সে, একচুলও নড়েনি। তারপর কখন যে মেস ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, নিজেও বলতে পারবে না। নির্জন একটা জায়গা দরকার ছিল তার, যেখানে বসে কাঁদলে কেউ শুনতে বা দেখতে পাবে না। সারা রাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সকালে ফিরে আসে মেসে, জিনিসপত্র গুছিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে, কোথায় যাবে নিজেও জানে না।

তিনটে মাস প্রায় পাগল হয়ে ছিল ফিউরি। এক শহর থেকে আরেক শহরে গেছে, কিন্তু কোথাও স্বস্তি পায়নি। দেখে মনে হত কেউ যেন তাকে ধাওয়া করছে আর সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে-সময় খানিকটা পাগলামির লক্ষণও দেখা দেয় তার মধ্যে। ব্যাপারটা নিজের কাছেই ধরা পড়ে। একা একা রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়, রেলস্টেশনে বা স্টিমার ঘাটে বিনিদ্র রজনী পার করার সময় বিড়বিড় করে আপনমনে কথা বলে। আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? এই চিন্তাটা তাকে ভয় পাইয়ে দেয়। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে সে। অনেক দিন পর দাড়ি কামায়, পোস্ট অফিসে গিয়ে চিঠি লেখে মাকে। তখন সে ঢাকায়। খুলনার বন্ধু রাহাতের কথা মনে পড়তে তাকেও একটা চিঠি লেখে, অনেকটা খেয়ালের বশেই। এক হপ্তা পর নাইট কোচের টিকেট কাটে সে, চলে আসে রাহাতের কাছে।

তানজিন আর ফিউরির সম্পর্কের কথা রাহাত জানত, ফিউরিকে এ-

ব্যাপারে আভাসে সাবধানও করে দিয়েছিল সে। কাজেই মেয়েটা ফিউরিকে এভাবে ধোঁকা দেয়ায় আশ্চর্য হলো না। বন্ধুকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাল সে, তার জন্যে কিছু একটা করার জন্যে চেষ্টাও শুরু করল। নিজের বাড়িতে রাখল তাকে, বলে দিল খুলনা ছেড়ে কোথাও যাবার দরকার নেই তার।

সকালে রাহাত অফিসে চলে গেলে একা হয়ে পড়ে ফিউরি। শুয়ে বসে কত আর সময় কাটানো যায়, রাহাতদের বইয়ের দোকানে চলে আসে সে। দোকানটা বেশ বড়, রাহাতের ছোট ভাই আহাদ চালায়, সন্ধের দিকে রাহাতও এসে বসে। ওদের পাশের দোকানটাও বেশ বড়, খুব ভাল বেচাকেনা, এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক চালান। দোকানটা তাঁর নয়, তাঁর বোনের, ভগ্নীপতি মারা যাবার পর তিনি দেখাশোনা করছেন। ফিউরিকে দেখে এই ভদ্রলোক খুব আগ্রহী হলেন। কোথাকার ছেলে, কতদূর লেখাপড়া, কি করে ইত্যাদি জানতে চেষ্টা করলেন তিনি। রাহাত ভদ্রলোককে সবই জানাল, ফিউরি সম্পর্কে একটু বোধহয় বাড়িয়েই বলল সে। ক'দিন পর রাহাতের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠালেন তিনি। তাঁর বোনের একটাই মাত্র মেয়ে, কোন ছেলে নেই। শহরের কাছাকাছি গ্রামে তাদের একটা বাড়ি ও বেশ কিছু জমিজমা আছে, আর আছে বইয়ের দোকানটা। মেয়েটা ম্যাট্রিক প... করার পর আর পড়াশোনা করেনি, দেখতে সুশ্রী। ভাগ্নীর জন্যে এমন একটা পাত্র খুঁজছেন তিনি যে ব্যবসা ও জমিজমা দেখাশোনা করতে পারবে। বন্ধুর জন্যে ভাল একটা চাকরির চেষ্টা করলেও কোথাও কোন আশা দেখতে পাচ্ছিল না রাহাত, ভদ্রলোকের প্রস্তাবটা তার ভাল লাগল। প্রস্তাবটা বন্ধুর সামনে এমনভাবে পরিবেশন করল সে, যেন রাজ্য ও রাজকন্যা দুটো একসঙ্গে পেয়ে যাচ্ছে ফিউরি। ফিউরির আপত্তি কানে তুলল না, ভদ্রলোককে কথা দিয়ে ফেলল, এ বিয়ে হবে।

দিশেহারা ভাবটা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ফিউরি, জীবনের

প্রতি বিতৃষ্ণা এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে কোন কিছুকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে না। রাহাতের বোন, খালা ও মা মেয়ে দেখতে গেল, ফিউরিকেও নিয়ে যাওয়া হলো প্রায় জোর করে। তারপর বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক হয়ে গেল, ফিউরিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই। এবং নির্দিষ্ট দিনে বিয়েটাও হয়ে গেল।

রাজকন্যার সঙ্গে রাজত্বও পেয়েছে ফিউরি, রাত এগারোটার দিকে বরযাত্রীরা ফিরে গেলেও, বরকে ফিরতে হলো না। বারোটার আগে একা হবার সুযোগ পেল না সে। ঘরের দরজা বন্ধ করার পর থেকে শুরু হলো তার শ্বাসকষ্ট। জীবনে এই প্রথম নিজেকে অচেনা লাগল ফিউরির। তার শ্বাসকষ্ট যে শারীরিক কোন রোগ নয়, এটা সে বুঝতে পারল। বুঝতে পারল, অক্সিজেনের অভাব বোধ করার কারণ হলো তীব্র একটা অপরাধবোধ।

এ-ধরনের অপরাধবোধে এর আগে কেউ কখনও আক্রান্ত হয়েছে কিনা বলা কঠিন। আজ তার ফুলশয্যা, আর আজই তার জীবনে নতুন করে ফিরে এল তানজিন। সে ধোঁকা দেয়ায় এতদিন তাকে ঘৃণাই করেছে ফিউরি, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো সেই ঘৃণাটার পাশাপাশি নতুন করে জেগে উঠল তানজিনের প্রতি অযৌক্তিক ভালবাসা। একই হৃদয়ে ঘৃণা ও ভালবাসা কিভাবে জায়গা করে নেয় বুঝতে পারল না সে, তবে উপলব্ধি করল তানজিনকে আজও এত বেশি ভালবাসে সে যে অন্য কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তার এমন কি তাকাতেও ইচ্ছে করে না। ফিউরির মনে হলো, তানজিন আমাদের প্রেমের মর্যাদা দেয়নি, না দিক, সেই একই অপরাধ আমি কেন করতে যাচ্ছি। ঘোমটা পরা নববধূর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল, জীবনে কখনও কোন মেয়েকে স্পর্শ করবে না সে।

ফিউরির মাথার ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এখন তাহলে কি করা!

নিরীহ একটা মেয়েকে কলমা পড়ে বিয়ে করেছে সে, ওর তো কোন অপরাধ নেই। তারপর তার মনে হলো, মেয়ে মাত্রই কি বিশ্বাসঘাতিনী নয়? তিন বছর অন্ধের মত তাকে ভালবেসেছিল তানজিন, তারপর অচেনা পুরুষকে বিয়ে করে সুখী হতে চেয়েছে। কে বলবে এই মেয়েটিও ঠিক তাই করছে না? সে-ও হয়তো একজনকে ভালবাসত। তানজিনের প্রতি তার মনে যে তীব্র ঘৃণা রয়েছে তার সবটুকু গিয়ে পড়ল অচেনা নববধূর ওপর। প্রতিশোধের একটা ইচ্ছা মাথাচাড়া দিল তার বুকে। তানজিন যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয়, দুনিয়ার কোন মেয়ে বিশ্বস্ত হতে পারে না।

বিছানায় বসে আছে মেয়েটা। আর ফিউরি তার দিকে পিছন ফিরে খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে। প্রায় আধ ঘণ্টা পার হলো। বিছানায় নড়েচড়ে বসল নতুন বউ। জানালার দিকে পিছন ফিরল ফিউরি, তার চেহারা পাথরের মত। বিছানার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল সে। ঘোমটার ভেতর ঘামছে মেয়েটা। সেদিকে তাকিয়ে ফিউরি বলল, 'কিছু মনে কোরো না, আমার মনটা খুব খারাপ। আমার মা···আমিই তার একমাত্র ছেলে··· মাকে কিছু না জানিয়ে এভাবে বিয়ে করে ফেলা উচিত হলো না। না-না, তোমার কোন দোষ নয়। দোষ আমারই। তুমি বসে না থেকে শুয়ে পড়ো, আমি চেয়ারটা নিয়ে জানালার সামনে কিছুক্ষণ বসব। তুমি কিছু মনে করবে না তো?'

ঘোমটার ভেতর মাথা নাড়ল বউ।

'তুমি কিন্তু বসে থেকো না, শুয়ে পড়ো। মনটা একটু ভাল হলে আমিও শোব।' চেয়ার টেনে জানালার সামনে বসল ফিউরি, সিগারেট ধরাল। শুরু হলো তার অপেক্ষার পালা।

এভাবে ভোর চারটে বাজিয়ে দিল সে। ইতিমধ্যে দু'তিনবার পানি খেতে চেয়ার ছেড়েছে। প্রতিবারই বুঝতে পেরেছে, শুয়ে থাকলেও জেগে

আছে মেয়েটা, অপেক্ষা করছে কখন তার স্বামী ফুলশয্যায় ফিরবে। কিন্তু না, ফিউরির মনে এতটুকু মায়া জাগেনি। মেয়েটা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আজানের ঠিক আগে। গহনাগুলো বেশিরভাগই খুলে বালিশের তলায় রেখে দিয়েছে সে।

চুপিসারে দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এল ফিউরি, আর ঠিক তখনই কাছাকাছি মসজিদ থেকে মুয়াজ্জীনের আহ্বান শোনা গেল। সোজা হেঁটে এল বাস টার্মিনালে, উঠে বসল একটা কোচে। মিনিট বিশেক পর ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলো কোচ।

সাতদিন পর ঢাকার দুটো দৈনিকে রাহাত একটা নিখোঁজ বিজ্ঞাপন ছাপল। ফিউরির ভাগ্য ভাল তার কোন ছবি রাহাতের কাছে ছিল না। বিজ্ঞাপনে রাহাত বন্ধুত্বের খাতিরে ফিরে যেতে বলেছে তাকে। পড়ার পর অপরাধবোধ জাগলেও নিজেকে শক্ত করল ফিউরি, সিদ্ধান্ত নিল কিছুদিন আর খবরের কাগজই পড়বে না। তবে মাসখানেকের মধ্যে বন্ধু মহলের প্রায় সবাই ব্যাপারটা জেনে গেল, রাহাতই তাদেরকে চিঠি লিখে সব জানিয়েছে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সরাসরি অস্বীকার করেছে ফিউরি, কিংবা এড়িয়ে যাবার জন্যে বলেছে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আলোচনা করতে ইচ্ছুক নয়। ক্ষতি হলো এই যে পুরানো বন্ধুরা দূরে সরে গেল সবাই।

গহনাগুলো বিক্রি করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা পেল ফিউরি। সিলেটে, নান্দীগ্রামে, মায়ের কাছে থাকল কিছুদিন, তারপর শহরে চলে এল। ইতিমধ্যে প্রথম বিয়ের পর কয়েক মাস পার হয়ে গেছে। ওদের গ্রামের বাড়িতে উকিলের একটা নোটিশ এসেছিল, তার স্ত্রী তাকে ডিভোর্স দিতে চায়। তার কোন আপত্তি নেই জানিয়ে একটা চিঠি লিখে সম্পর্কটা চিরতরে ছিন্ন করেছে সে।

শহরে এল ফিউরি চাকরির চেষ্টায় নয়। চাকরি করার ইচ্ছে আর নেই

তার। হোটেলে থাকে, খায়দায় ঘুরে বেড়ায়, সন্ধান করে কোন মক্কেল ফাঁসানো যায় কিনা। বিয়ে করে পালিয়ে যাওয়া, ব্যবসা হিসেবে অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। সমাজ ও নারীজাতির ওপর তার একটা আক্রোশ আছে, সেটাও চরিতার্থ হয়।

দ্বিতীয় বিয়েটাও প্রথমটারই পুনরাবৃত্তি বলা যায়। বগুড়ার মেয়ে, বাবা ব্যবসা উপলক্ষে সিলেটে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করেন। ফিউরির হোটেলেই ওঠেন তিনি, ফিউরিকে কয়েক দিন লক্ষ করার পর পাত্র হিসেবে মনে ধরে যায়। ফিউরি নিজের নাম পাল্টে তখন আহসান চৌধুরী। তিন কুলে কেউ নেই তার, ভাল একটা পরিবারে বিয়ে করে আত্মীয়স্বজন পেতে চায়। বগুড়া থেকে নিয়ে আসা হলো মেয়েকে, পনেরো দিনের মধ্যে বিয়েও হয়ে গেল। এবং যথারীতি ফুলশয্যার রাতে সিলেট থেকে ঢাকায়, ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে পালিয়ে এল ফিউরি, এবারও গহনাগুলো সঙ্গে নিতে ভোলেনি।

বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে তৃতীয় বিয়েটায়। চাটগাঁ শহরেরই মেয়ে, মেয়ের বাবা এডভোকেট, তবে অবসর নিয়েছেন। ফুলশয্যার রাতে ফিউরিকে অসুস্থতা বা মন খারাপের ভান করতে হয়নি। মেয়েটাই প্রথম কথা বলে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ফিউরিকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয় সে।

'এখানে আমাকে জোর করে বিয়ে দেয়া হয়েছে,' ঘোমটা সরিয়ে স্পষ্ট করে বলে মেয়েটা। 'আমার পক্ষে আপনাকে সুখী করা সম্ভব নয়। আমি অন্য একটা ছেলেকে ভালবাসি।'

'এখন তাহলে আমাকে কি করতে বলো তুমি?' জিজ্ঞেস করে ফিউরি।

'আপনি চলে যান,' প্রস্তাব দেয় নববধূ। 'তাতে আপনার নিন্দা হবে, কিন্তু আমি বেঁচে যাব। আপনি চলে গেলে বাবা এবার হয়তো আমার জেদের কাছে হার মানবে, আমি আমার ভালবাসার মানুষকে পাব।'

'শুধু নিন্দা হবে, বিপদও তো হতে পারে।'

'কি বিপদ হবে? আপনার সম্পর্কে কেউই তো কিছু জানে না।'

'তা বটে। কিন্তু তুমি বললেই আমি চলে যাব, খালি হাতে?'

'খালি হাতে কেন। বলুন কি চান আপনি। সকাল হোক, ঠেলাগাড়ি ডেকে সমস্ত ফার্নিচার, টিভি, ফ্রিজ, যা কিছু আছে সব আপনি অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলুন, আমার কোন আপত্তি নেই। গহনাগুলোও নিয়ে যেতে পারেন। এ-সব আমার কোন দরকার নেই, আমি শুধু যাকে ভালবাসি তাকে পেতে চাই।'

না, গহনা ছাড়া আর কিছু নেয়নি ফিউরি। কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, পিছন থেকে মেয়েটা বলেছিল, 'আপনি কে বা কেমন মানুষ জানি না, তবে আপনার এই উপকার চিরকাল মনে রাখব আমি।'

সিগারেট শেষ করে চারদিকে তাকায় ফিউরি, সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। তার বোধহয় এবার নিউ মার্কেটের ভেতর ঢোকা উচিত। ভেতরে প্রচুর মেয়ে ও মহিলা আছে, একবার চোখ বুলিয়ে দেখা দরকার। আরও একটা বিয়ে না করে, নাহয় বিবাহিতা মহিলাদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয়ই করবে, পয়সা কামানো নিয়ে কথা।

আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে এগোয় ফিউরি। বাম দিকে ঘুরতেই পাশাপাশি বইয়ের দোকানগুলো দেখতে পায়, অমনি মনে পড়ে যায় ঢাকা থেকে ভাল দেখে কয়েকটা উপন্যাস কিনে পাঠাতে বলেছিল শিখা। কিছু টাকাও দিয়েছিল সে। একই সঙ্গে মনে পড়ল রনির কথা, কচি মুখে মাত্র বোল ফুটেছে, 'আমারও বই আনবা।'

তিনশো টাকা খরচ করে কয়েকটা বই কিনল ফিউরি, রনির জন্যেও কিনল বাংলা আর ইংরেজি বর্ণ-পরিচয়। নিজেকে বলে রাখল, কাল সকালেই এগুলো রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়ে দিতে হবে চট্টগ্রামে। কি মনে করে রনির জন্যে পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে ছোট্ট একটা খেলনা গাড়িও কিনে

ফেলল।

হাত প্রায় খালি হয়ে যাওয়ায় চিন্তায় পড়ে গেল ফিউরি। অবশ্য ঢাকায় ওর নতুন বন্ধুরা একটা অপারেশনের কথা বলে রেখেছে তাকে, কালই সেই দিন। ভাগ্য ভাল হলে দেড় দু'হাজার টাকা আসতে পারে হাতে।

বইগুলো আর খেলনাটা কেনার পর কাজের কথা ভুলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে ফিউরি। যাদের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে চায় না, সেই শিখা আর রনির কথাই বার বার উঁকি দেয় মনে। সে আর কি লক্ষ করবে মেয়েদের, মেয়েরাই বরং তাকিয়ে আছে তার দিকে। যেখানেই যায়, এই কাণ্ডটা ঘটে। তার চেহারা, বিশেষ করে চোখ দুটো, এত সুন্দর যে একবার তাকালে সহজে দৃষ্টি ফেরানো যায় না। ফিউরি বোঝে, প্রতারকদের চেহারা হওয়া উচিত সাদামাঠা, সাধারণ, বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য থাকা চলবে না, মানুষ যাতে দেখেও মনে রাখতে না পারে। সেদিক থেকে দেখলে তার এই পেশার জন্যে চেহারাটা বিপজ্জনক। সেজন্যেই একই শহরে বেশিদিন থাকে না সে, বিভিন্ন শহরে শিকার খুঁজে বেড়ায়।

নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে আসে ফিউরি। খুব ইচ্ছে হয় কোথাও বসে কিছু খায়, কিন্তু পকেটের অবস্থার কথা ভেবে দমন করে ইচ্ছেটা। সিদ্ধান্ত নেয় তাড়াতাড়ি ফিরে যাবে হোটেলে, খাওয়াদাওয়া সেরে ম্যাগাজিনগুলো পড়বে। পুরানো বইয়ের দোকান থেকে এ-মাসেও কয়েকটা টাইমস আর নিউজউইক কিনেছে সে, পড়ার সময় পায়নি।

এলিফেন্ট রোড ধরে ফিরছে ফিউরি। প্রথমে তাকে মগবাজারে যেতে হবে, গ্যারেজে গাড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে রিকশা নিয়ে ফিরতে হবে রামপুরায়, তার হোটেলে। হোটেলের ম্যানেজার তার পরিচিত, তবু দু'দিন ধরে টাকার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে তাকে। যেভাবেই হোক দু'একদিনের মধ্যে কিছু টাকা তাকে পেতেই হবে। তারপর মনে পড়ল, তার কাপড়চোপড়ের অবস্থাও ভাল নয়। অবশ্য ঢাকায় এত লণ্ড্রি থাকায়

সেজন্যে খুব একটা চিন্তার কিছু নেই। তবু ঝোঁকের মাথায় এতগুলো টাকা খরচ করে ফেলা উচিত হয়নি তার। শিখার বইগুলো পরে কিনলেও পারত।

রোডের দু'পাশে সারি সারি দোকান, উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। হঠাৎ করেই একটা মেয়েকে দেখতে পেল ফিউরি। চারপাশে আরও অনেক মেয়ে ও মহিলা রয়েছে, তাদের মধ্যে সুন্দরীরও অভাব নেই, অথচ সবাইকে বাদ দিয়ে ওই মেয়েটার ওপরই আটকে গেল তার চোখ। এক হারা গড়ন, কোনমতেই ফর্সা বলা যাবে না। ফিউরির আকৃষ্ট হবার কারণ আড়ষ্ট ও লাজুক ভাবটুকু। চোখ দুটোয় প্রচুর মায়া আর দৃষ্টিতে আশ্চর্য গভীরতা লক্ষ করল সে। না, ফিউরির হৃদয়ে কোন ঢেউ ওঠেনি, কোন পুলকও সে অনুভব করেনি। তীক্ষ্ণ পেশাদারি দৃষ্টিতে মেয়েটাকে দেখছে সে। তার কাপড়চোপড় খুব যে একটা দামী তা নয়, তবে সৌখিনতা আর রুচির ছাপ স্পষ্ট। মোটা গরদের পাঞ্জাবী এই প্রথম কোন মেয়েকে পরতে দেখছে ফিউরি। বুক জুড়ে বহুরঙা নকশা থাকলেও, শরীরে এত সুন্দর ফিট করেছে, মনে হলো রেডিমেড কেনা হয়নি, অর্ডার দিয়ে বানানো হয়েছে। পায়ে পাটের রশি পাকিয়ে তৈরি করা স্যাণ্ডেল, পাঞ্জাবীর রঙের সঙ্গে ম্যাচ করা। পাঞ্জাবীর নিচে কালো পায়া দেখে বোঝা গেল প্যান্ট পরে আছে।

ইতিমধ্যে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়েছে ফিউরি। স্যুট পরা এক তরুণের পিছু পিছু একটা দোকানে ঢুকতে দেখল মেয়েটাকে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল সে। ক্রোকারিজের দোকান, তৈজসপত্র বিক্রি হয়। মনটা খারাপ হয়ে গেল ফিউরির। মেয়েটার কি বিয়ে হয়ে গেছে? সঙ্গের তরুণটি কি তার স্বামী? এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে সে-ও ভেতরে ঢুকল।

একজন সেলসম্যান বাক্স খুলে বের করল একটা রেণ্ডার মেশিন।

আরেকজন সেলসম্যান হাসিমুখে এগিয়ে এল ফিউরির দিকে।

ফিউরি শুনতে পেল মেয়েটা অবাক গলায় বলছে, 'রায়হান ভাই! আপনি না গতমাসে একটা রেঞ্জার কিনলেন? আজ আবার···?'

দ্বিতীয় সেলসম্যানকে ফিউরি নিচু গলায় বলল, 'কিছুদিন আগে এদিকের কোন দোকানে শ্বেত পাথরের চকচকে একটা মূর্তি দেখে গিয়েছিলাম আমি। ওটা একটা অ্যাশট্রে ছিল···।' তরুণ ও তরুণীর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে সে, চোখ বুলাচ্ছে ওপরের শেলফগুলোয়।

ইতস্তত করছে তরুণ, রীতিমত নার্ভাস গলায় জবাব দিল, 'না···মানে···ওটা তো বাড়ির জন্যে কিনেছিলাম, এটা এক আত্মীয়ার বিয়েতে প্রেজেন্ট করব।'

ব্যাপারটা কি? তরুণ যে কিছু একটা গোপন করে গেল, স্পষ্ট বুঝতে পারল ফিউরি। গলার আওয়াজেই ধরা পড়ে গেছে সে। আরও বোঝা গেল, মেয়েটা তার স্ত্রী নয়।

দ্বিতীয় সেলসম্যান বলল, 'আসলে এ-সব জিনিস তো ইমপোর্ট হয় না, ব্যাগেজ রুলে কেউ কেউ এনে আমাদের কাছে বিক্রি করে, দোকানে রাখার সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ দিয়ে নিয়ে যায় মানুষ। আপনাকে মাঝে মাঝেই খোঁজ করতে হবে, তবে যদি পান।'

দোকান থেকে বেরিয়ে এল ফিউরি। দশ মিনিট পর ওরা দু'জনও বেরুল। ওদের পিছু নিল সে।

'লিলি, এসো কিছু খাই,' একটা রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল তরুণ, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে ফিউরিও; একটা দোকানের শো-কেসের ভেতর তাকিয়ে জুতো দেখছে। ওদের কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে।

কব্জিতে বাঁধা হাতঘড়ি দেখল মেয়েটা। ফিউরি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। মেয়েটার হাতঘড়িতে চেইন বা চামড়ার ফিতে নেই, তার বদলে

রয়েছে সরু কয়েক প্রস্থ পাটের রশি। 'রায়হান ভাই, অফিস থেকে বেরুবার সময় কি বললাম ভুলে গেছেন?' হেসে উঠল মেয়েটা। 'আপনি আজ এত অন্যমনস্ক কেন বলুন তো?'

'অন্যমনস্ক? কই, না তো!' আড়ষ্ট হেসে প্রতিবাদ জানায় তরুণ।

'প্রাইম স্পোর্টসে আজ কনচিটা ভিকারিয়ো আর স্টেফি গ্রাফের খেলা, দেখতেই হবে আমাকে। তাছাড়া, অফিস থেকে বেরুবার সময় আপনি না বললেন কোথায় যেন দাওয়াত খেতে যাবেন?'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো! ঠিক আছে, চলো তাহলে তোমাকে পৌঁছে দেই। স্টেটস থেকে আজ একটা ফোন আসারও কথা আছে···।'

'ভাবীর?'

'হ্যাঁ।'

ফুটপাথ থেকে নেমে, ফুটপাথ ঘেঁষেই হাঁটতে শুরু করল ওরা। ফিউরি ধারণা করল, ওরা বোধহয় বেবীট্যাক্সি বা রিকশা নেবে। কিন্তু না, সাদা একটা টয়োটার পাশে থামল দু'জন।

তাড়াতাড়ি নিজের গাড়িতে ফিরে এল ফিউরি। অনুসরণ করল টয়োটাকে। তার ধারণা হলো, দু'জনেই ওরা কোন অফিসে চাকরি করে। তরুণ বিবাহিত, তবে মেয়েটার প্রতি তার দুর্বলতা আছে বলে মনে হয়। মেয়েটার বস্‌ও হতে পারে সে, হয়তো অন্যায় কোন সুযোগ নেয়ার মতলবে আছে। তবে মেয়েটা যে সহজে কারও ফাঁদে পা দেবে না, তা তার সতর্ক হাবভাব দেখে বেশ বোঝা যায়। আড়ষ্ট আর লাজুক ভাব তার চেহারায় দুর্লভ মেকআপ, পুরুষের মন জয় করার জন্যে অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, তবে কথাবার্তায় দ্বিধাহীন ও স্পষ্ট। তাকে ফিউরির অত্যন্ত সচেতন ও বুদ্ধিমতী বলে মনে হলো। লজ্জাটে ভাবটুকু স্রেফ শারীরিক প্রতিক্রিয়া। মনটা যদি স্বাধীনচেতা হয়ও, সেটার ওপর পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণ আছে।

শাহবাগ হয়ে সেগুনবাগিচায় চলে এল সাদা টয়োটা, একটা দোতলা বাড়ির সামনে থামল। টয়োটাকে পাশ কাটিয়ে ধীর গতিতে এগোল সুবারু, বাড়িটা ভাল করে দেখে নিল ফিউরি। এরইমধ্যে ওর মাথায় একটা প্ল্যান তৈরি হয়েছে। ওর দু'জন বন্ধুকে লাগিয়ে দিলেই হবে, দু'দিনেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে ফেলবে তারা। তারপর নিখুঁত একটা ফাঁদ পাততে হবে। ফাঁদটা কি রকম হবে তা-ও মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে ফিউরি।

বাড়িটা ছোট, তবে পাড়াটা সেগুনবাগিচা। বাড়িটা যদি মেয়ের বাবার হয়, রীতিমত ধনী পরিবারের মেয়ে বলতে হবে তাকে। আজকাল তো অনেক ধনী পরিবারের মেয়েও চাকরি করে—শখ বা ফ্যাশন।

ক্লান্তি ও হতাশা দূর হয়ে গেছে ফিউরির। তার মন বলছে, লিলি নামের মেয়েটাকে ফাঁদে ফেলা তার জন্যে পানির মত সহজ। আর একবার ঠিকমত ফাঁসাতে পারলে কম করেও পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় হবে। আরও বেশি, এক লাখ হওয়াও বিচিত্র নয়। মনের সুখে আরেকটা বেনসন ধরাল সে।

ফিউরি জানে না এবার সে একটা বিষম ধাক্কা খেতে যাচ্ছে। অন্য একটা ফাঁদে তাকেই বরং আটকা পড়তে হবে।

দুই

শিশু শাহিনের প্রথম অভয় ও প্রেম তার মা। মায়ের কাছ থেকে পাওয়া দুধ,

ঘাম, কাপড়কাচা সাবান আর মশলার গন্ধ তাকে স্বস্তি ও আনন্দের অনুভূতি দান করে। জননী চান তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানটি যেন দুনিয়ার বুকে আনন্দের একটি নির্ঝর হয়ে ওঠে, কাজেই তার সঙ্গে তিনি সারাক্ষণ শুধু স্নেহ-ভালবাসাময় ও হাস্যমুখর খেলার সম্পর্ক রচনা করেন। কোন কারণে যদি তাঁর মন খারাপ থাকে, হয় তখন তিনি ছেলের সামনে আসেন না, নয়তো মনের দুঃখ চেপে রেখে হাসতে ও খেলতে বাধ্য করেন নিজেকে। তিনি তাঁর অন্যান্য সন্তানদেরও বলে দিয়েছেন, শাহিনের সামনে কেউ ঝগড়া করতে পারবে না, এবং কোন কারণ না থাকলেও হাসতে হবে সবাইকে। বাবা তার কাছে রহস্যময় পুরুষ, সম্পূর্ণ অচেনা একটা জগতের প্রতিনিধি, এই আছেন এই নেই—তাঁর গা থেকে বেরুনো সিগারেট বা সেন্টের গন্ধ, আদর করার আড়ষ্ট ভঙ্গি, ভারি কণ্ঠস্বর, ছকে বাঁধা হাঁটাচলা, আনুষ্ঠানিক পোশাক, কর্তাসুলভ গাম্ভীর্য ইত্যাদি সবই তাকে হকচকিয়ে দেয়, আবার একই সঙ্গে মুগ্ধও করে। প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষটিকে গভীরভাবে লক্ষ করে সে, তাঁর মত হবার আকাঙ্ক্ষা জাগে মনে, অচেনা জগৎটাকে দেখার ও বোঝার তীব্র আগ্রহ জন্মায় তার ভেতর। বাবাই তাকে বন্দী জীবন থেকে বের করে এনে পৌঁছে দেন স্কুলে। তারপর তার হাত ধরে খেলার সাথীরা, বয়েসে বা অভিজ্ঞতায় যারা একটু এগিয়ে আছে, হয়তো ডানপিটে বা অবাধ্য, নিষেধের বেড়া টপকাবার সাহস রাখে বুকে।

শাহিনের তখন এগারো বছর বয়েস। ক্লাস সিক্সে পড়ে। থাকে গোপীবাগে, পড়েও রামকৃষ্ণ মিশনে, তবে খেলার সাথীরা প্রায় সবাই মতিঝিল কলোনির ছেলে। স্কুলে ভর্তি হবার পর তাকে বাইরের দুনিয়াটা চিনিয়েছে রেহান।

রেহান তার জীবনে একটা ধাঁধা। তার বয়েস পনেরো, একই স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে, একই পাড়ায় বসবাস। শাহিনকে নিয়ে ঢাকা শহরের

কোথায় না যায় সে। বেশিরভাগ সময় রেহানের হাতে চটের একটা ব্যাগ থাকে, সেটা কখনও অসম্ভব ভারি মনে হয়, আবার কখনও যথেষ্ট ফুলে থাকলেও তত ভারি লাগে না। হাঁটতে হাঁটতে নয়াবাজারে কিংবা ধোলাই খালে চলে আসে ওরা, শাহিনকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যায় রেহান। ফেরে দশ বা বিশ মিনিট পর, ভাঁজ করা হাতের ব্যাগটা তখন বগলের তলায়, মুখে বিজয়ীর হাসি।

'কি ছিল তোমার ব্যাগে?' জানতে চায় শাহিন।

বেশিরভাগ সময় শুনতে হয়, 'তোকে বলা যাবে না।' আবার কখনও হয়তো বলে, 'খবরের কাগজ।'

'খবরের কাগজ? কাকে দিয়ে এলে?'

'তোকে বিশ্বাস করি বলে বলছি। কাউকে বলবি না। প্রেস্টিজের ব্যাপার, বুঝলি। বাড়ি থেকে হকারের কাছে বিক্রি করলে সের প্রতি দু'টাকা কম পাই, তাই নয়াবাজারে বিক্রি করি।'

কিছু কিছু ধাঁধার সমাধান পেয়ে যায় শাহিন। সে বুঝতে পারে, প্রেস্টিজ আর প্রফিট ছাড়া আর কিছু বোঝে না রেহান। সারাক্ষণ এই দুটো কিভাবে বাড়ানো যায় সেই তালে থাকে। দু'একটা ধাঁধার সমাধান হয় বটে, কিন্তু নতুন নতুন আরও অনেক ধাঁধার জন্ম দেয় রেহান।

একদিনের ঘটনা। পাড়ার কয়েকজন মুরুব্বী ধরাধরি করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন শাহিনকে। তার শার্ট ছিঁড়ে গেছে, নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, ফুলে উঠেছে কপাল। মুরুব্বীদের সঙ্গে রেহানের বাবা আরমান চৌধুরীও আছেন। কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করলেন তিনি। ওদের এক বন্ধুর বাড়িতে কাল বিকেলে ওরা কয়েকজন বেড়াতে গিয়েছিল। তার নাম এনাম। সে আজ মাঠে খেলতে এসে জানায়, কাল ওদের বাড়ি থেকে একটা টেবিল ঘড়ি চুরি গেছে। ভদ্রলোকের ভাষায়, নিশ্চয়ই কোন ছোট বংশের ছেলে হবে—ঘড়িটা কাউকে নিতে দেখেনি, তবু যাকে সামনে

পেয়েছে তাকেই চোর সন্দেহে পেটাতে শুরু করে। এরমধ্যে শাহিন স্বীকার যায়, ঘড়িটা সে নিয়েছে। সবাই তখন ঘড়িটা ফেরত দিতে বলে ওকে। কিন্তু ও বলছে, সেটা নাকি হারিয়ে ফেলেছে। ছেলেরা তখন রেগে গিয়ে ওকে মারধর করে। খবর পেয়ে ছুটে যান আরমান চৌধুরী।

মা আর ভাই-বোনরা তখন শাহিনের শুশ্রূষা করতে ব্যস্ত। আরমান সাহেবকে তারা কেউ অবজ্ঞা করল না, আবার তাঁর কথার কোন জবাবও দিল না। তাদের সবার আচরণই অদ্ভুত লাগল আরমান সাহেবের। শুধু অদ্ভুত নয়, রীতিমত সন্দেহজনক মনে হলো। তিনি বুঝতে পারলেন না শাহিনকে নিয়ে এভাবে তারা সবাই হাসি-ঠাট্টা করছে কেন। অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর, পারিবারিক প্রেস্টিজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন, অথচ সে ব্যাপারে ওদের যেন কোন মাথাব্যথা নেই। শাহিনের মাথায় পানি ঢালার সময় তার মা বললেন, 'শার্টটা ছিঁড়েছে ভালই হয়েছে, না রে? নতুন একটা পাবি। আর খবরের কাগজে কি লিখেছে সেদিন নিজেই তো পড়ে শোনালি—মাঝেমধ্যে রক্ত দান করা শরীরের জন্যে ভাল।' রসিকতা করছেন, কিন্তু চেষ্টা করেও হাসতে পারছেন না তিনি। সেই ছোটবেলা থেকে কিডনির অসুখে ভুগছে ছেলেটা, ওর রক্তের যে কি দাম তা তাঁর চেয়ে ভাল আর কে জানে।

শাহিনের বড় বোনটা বলছে, 'ওর প্যান্ট তো ভিজিয়ে দিলে তুমি, মা। হাত সরাও, খুলে দেই। এই, কেউ একটা শুকনো প্যান্ট নিয়ে আয় তো।'

মায়ের কোলে মুখ গুঁজে চোখ বন্ধ করে পড়ে ছিল শাহিন, মা ও ভাই-বোন তাকে হাসাবার চেষ্টা করছে বুঝতে পেরে হাসছিলও সে, বড় বোনের কথা শুনে নাভির কাছে প্যান্টটা দু'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল, বলল, 'না।'

মেজো বোন টিপ্পনী কাটল, 'খবরদার, কেউ ওকে তোমরা ন্যাংটো

করতে পারবে না। আমাদের শাহিন এখন বড় হয়ে গেছে। ছুটকি, ওর প্যান্টটা বাথরুমে দিয়ে আয়।'

অন্যান্য মুরুব্বীরা ফিরে গেছেন, আরমান সাহেবও ফিরে যাবার তাগাদা অনুভব করছেন। তিনি একটু বেসুরো গলায় বললেন, 'ঘড়িটা সত্যি হারিয়ে ফেলেছে, নাকি কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, জানতে পারলে ভাল হত। এনাম ছেলেটা সুবিধের নয়, রাস্তায় পেলে আবার হয়তো মারধর করবে। ওর বাপ সম্পর্কে যা শুনলাম, ঘড়িটা ফেরত না পেলে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বেন। পাড়ায় আপনাদের একটা সম্মান···।'

শাহিনের মা মুখ তুলে বললেন, 'আপনি ভাই অনেক কষ্ট করেছেন। বসুন, আপনাকে এক গ্লাস সরবত খাওয়াই।'

'আমি আনছি,' বলে এক ছুটে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেল শাহিনের বড় বোন।

তিনি যে প্রসঙ্গে কথা বলতে চান সে প্রসঙ্গটা সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, বুঝতে পেরে মনে মনে রেগে গেলেন আরমান সাহেব। বললেন, 'আমি কি বলতে চাইছি আপনি বুঝতে পারছেন না, ভাবী। আপনার মেয়েকে সরবত আনতে বারণ করুন। ঘড়িটা···।'

শাহিনকে বুকে নিয়ে সোফা ছাড়লেন শাহিনের মা, বললেন, 'সে ব্যাপারে আপনাকে ভাই কোন চিন্তা করতে হবে না। কি ঘটেছে আগে শাহিনের মুখ থেকে শুনি, তারপর আমরাই যা করার করব।'

'ছেলেটাকে চোর বানাচ্ছে ওরা,' বাইরে বেরিয়ে এসে বিড়বিড় করলেন আরমান চৌধুরী। দ্রুত পায়ে বাড়ির পথ ধরলেন তিনি, কারণ শাহিনের চেয়ে অনেক বেশি মার খেয়েছে তাঁর রেহান। ছেলেকে বাড়িতে রেখে তাড়াতাড়ি শাহিনদের বাড়িতে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি, প্রেস্টিজ রক্ষার স্বার্থে।

মায়ের নরম বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে শাহিন. যেন

খুদে একজন বাদশা। ভাই ও বোনেরা তাকে ঘিরে বসেছে। ইতিমধ্যে বাথরুম থেকে প্যান্ট পাল্টে এসেছে সে, নতুন একটা শার্টও গায়ে চড়িয়েছে। ছোট বোনটা চামচ দিয়ে গরম স্যুপ খাওয়াচ্ছে তাকে।

'এতদিনে সুযোগ পাওয়া গেছে,' বলে মেজো বোন শাহিনের একটা পা টেনে নিয়ে ব্লেড দিয়ে নখ কাটতে শুরু করল।

সেজো ভাই বসেছে শাহিনের পাশে, তার হাতে খোলা পারিবারিক অ্যালবাম। 'বল দেখি, কার ছবি এটা? বড়দা তুলেছিল, তোর বয়েস তখন তিন ঘণ্টা বারো মিনিট—ঠাট্টা না, এই দেখ, ছবির পিছনে লেখা আছে।' অ্যালবাম থেকে ছবিটা খুলে শাহিনকে দেখায় সে।

শাহিনের মা ঘরে ঢোকেন, বিছানায় উঠে কনিষ্ঠ সন্তানের মাথার কাছে বসেন। তারপর ঝুঁকে ছেলের কানে ঠোঁট দিয়ে সুড়সুড়ি দেন, আলতো করে চুমো খান ফুলে ওঠা কপালটায়, বলেন, 'তোরা কেউ জানতে চাইছিস না? জিজ্ঞেস করলে এবার বোধহয় বলবে ও।'

ছোট বোনের বাড়ানো চামচটা হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল শাহিন, পা টেনে মেজো বোনকে নখ কাটতে বাধা দিল, তারপর মাত্র তিনটে বাক্যে ব্যাখ্যা করল কি ঘটেছিল। এনাম আর তার বন্ধুরা রেহানকে মেরে ফাটিয়ে দিচ্ছিল। তাদের ধারণা, ঘড়িটা সেই নিয়েছে। শাহিনের ভয় হয় তাকে ওরা না মেরেই ফেলে। কোনভাবেই ওদেরকে থামাতে না পেরে বাধ্য হয়ে চিৎকার করতে হয় তাকে—'তোরা ওকে মারছিস কেন, ঘড়িটা তো আমি নিয়েছি।'

কেউ জিজ্ঞেস করল না সত্যি সত্যি শাহিনই ঘড়িটা নিয়েছে কিনা। তাকে প্রশ্ন করা হলো, রেহানকেই ওরা সন্দেহ করল কেন? শাহিন জানাল, এর আগেও কয়েকজন বন্ধুর এটা-সেটা চুরি গেছে, তার মধ্যে অন্তত একটা জিনিস যে রেহান নিয়েছিল তা ওরা জানে। পরবর্তী প্রশ্ন, এখন তাহলে কি হবে? এখনও কেউ জিজ্ঞেস করছে না ঘড়িটা শাহিনই

নিয়েছে কিনা। শাহিন যেমন জানে, তেমনি বাড়ির আর সবাইও জানে, প্রশ্নটা কোনদিনই তোলা হবে না। বাড়ির সবাই যেমন শাহিনকে চেনে, শাহিনও তেমনি চেনে তাদেরকে।

পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরে শাহিন জানাল, সে নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না এরপর কি ঘটতে পারে। ঘড়িটা সে নিয়েছে বলার পর এনামরা তাকে মারধর করেছে বটে, তবে সেটা আসল ঘটনা জানার জন্যে, চুরির অভিযোগে নয়। সে যে রেহানকে বাঁচাবার জন্যে কথাটা বলেছে, সবাই ওরা বুঝে ফেলেছে।

তার কি ধারণা, ঘড়িটা রেহানই নিয়েছে?

চুপ করে থাকল শাহিন, ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে হাঁ করল, অর্থাৎ প্রশ্নটার উত্তর দিতে চায় না।

এখন সে কি করবে বলে ভাবছে? এনাম যদি ঘড়িটা তার কাছে দাবি করে? এনামের বাবা যদি পাড়ার মুরুব্বীদের কাছে বিচার দেন?

ঘড়িটা কত বড়, কি রকম দেখতে, কি নাম ইত্যাদি সম্পর্কে ওদেরকে একটা ধারণা দিল শাহিন, তারপর জানতে চাইল, 'এরকম একটা টেবিল ঘড়ির কি রকম দাম হতে পারে?'

হেসে উঠে ছবির অ্যালবামটা বন্ধ করল মেজো ভাই, বলল, 'তুই যে সমাধানের কথা ভাবছিস ওটা কোন সমাধানই না। যদিও আমার পরীক্ষা চলছে, তবু রেহান আর এনামের সঙ্গে কাল বা পরশু কথা বলব আমি। আগে বুঝতে হবে কে কি ভাবছে, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।'

কেউ তাকে একটি বারও বলল না যে রেহানকে বাঁচাতে গিয়ে এভাবে নিজের ঘাড়ে দোষ চাপানো উচিত হয়নি তার। রেহান বা এনামের কোন নিন্দাও কেউ করল না। রাতে ভাই-বোনরা সবাই পড়তে বসেছে যে যার টেবিলে, ওদের ইঞ্জিনিয়ার বাবা বাড়ি ফিরলেন। হর্ন শুনে গেট খুলে দিল দারোয়ান, গ্যারেজে গাড়ি রেখে ড্রইংরুমে ঢুকলেন তিনি, বসার আগে

ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘরে উঁকি দিলেন একবার। শাহিনের টেবিলটা খালি দেখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন তিনি, তবে কোন প্রশ্ন করলেন না, হেঁটে এসে স্ত্রীর সামনের একটা সোফায় বসলেন। রোজ এ-সময়টা ড্রইংরুমে বসে থাকেন শাহিনের মা, স্বামীর অপেক্ষায়। খুবই অল্প কথায় পড়ার টেবিলে শাহিনের অনুপস্থিতির কারণটা ব্যাখ্যা করলেন তিনি।

শাহিনের বাবা মুখ কালো করে জানতে চাইলেন, 'পরে আর নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে? কপাল ফুলে আছে···কোথাও কেটে-ছিঁড়ে যায়নি তো?'

শাহিনের মা বললেন, 'না। কোথাও কাটেনি। ও আমাদের বিছানায় শুয়ে পড়ছে।'

শাহিনের বাবা ভাবলেন, তার ছোট ছেলে হয়তো আশা করছে বাড়িতে ফিরেই তাকে দেখতে যাবেন তিনি। কিন্তু তা তিনি গেলেন না। রোজকার মতই, বেশ কিছুক্ষণ পর কাপড়চোপড় ছাড়লেন, হাত-মুখ ধুলেন, তারপর টেবিলে খাবার দিতে বলে নিজেদের বেডরুমে চলে এলেন।

তাঁর এই ছেলেটা দেখতে যদিও নাদুসনুদুস, ভেতরে একটা অসুখ আছে। চোখ দুটো এমনিতেই বড়বড়, তার ওপর দুনিয়াটাকে দেখার ও বোঝার চেষ্টায় সারাক্ষণ বিস্ফারিত হয়ে আছে। ছেলেটার মধ্যে শান্ত ও স্থির একটা ভাব এতটাই বেশি, যেন কি একটা অভিমানে গুম মেরে আছে। চারপাশে যা কিছুই ঘটুক না কেন, সেটা দেখার ও হজম করার কাজে এমনই মগ্ন হয়ে পড়ে, যেন ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছে না তার, সেজন্যেই কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তারপর অনেক দেরিতে আদৌ যদি কোন প্রতিক্রিয়া হয়ও, সবাইকে হতভম্ব করে দেয়ার মতই হয়।

শাহিনের আঘাতগুলো পরীক্ষা করলেন তিনি, মন্তব্য করলেন, 'কিছু না, সামান্য ব্যাপার।' তারপর তাকে নিয়ে চলে এলেন খাবার টেবিলে।

খেতে বসে কেউ প্রসঙ্গটা তুলল না। ওদের বাবা একটা কনসাল্টিং ফার্মের মালিক, আজ সারাদিনে সেখানে মজার ঘটনা কি কি ঘটেছে সব বর্ণনা করলেন তিনি। তারপর ছোট মেয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'তোর প্রস্তাবটা নিয়ে আজ আমি চিন্তা করছিলাম। কথাটা ঠিকই বলেছিস, বিটিভির অনুষ্ঠান খুবই বাজে হচ্ছে। হপ্তায় একটা দিন, ছুটির দিন শুক্রবারে, সকালে আর রাতে আমরা নিজেরাই বাড়িতে অনুষ্ঠান করতে পারি। আমরাই হাসির নাটক লিখব, অভিনয়ও আমরা করব। বাড়িতে শিল্পীর তো কোন অভাব নেই, তাই না? আমাদের মধ্যে গায়ক-গায়িকা আছে, মঞ্চে নাটক করার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ অভিনেতা আছে, নৃত্যশিল্পী আছে···।'

টেবিল চাপড়ে, হাততালি দিয়ে, কেউ কেউ বাবার গলা জড়িয়ে ধরার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উল্লাস প্রকাশ করল। খাওয়া শেষ হতে শাহিনকে নিয়ে আবার নিজেদের বেডরুমে ফিরে এলেন তার বাবা। ছেলেকে নিজের পাশে বসিয়ে একটা রূপকথা শোনালেন তিনি। সেই পুরানো গল্প, তবে শাহিন আগে কখনও শোনেনি। এক জঙ্গলে ছিল এক নরম তুলতুলে খরগোস। তার শরীর যেমন নরম, তেমনি নরম তার মনটাও। খুদে ও দুর্বল খরগোস প্রাণী জগতের সমস্ত দুঃখ-বেদনা আর শোক একা নিজের কাঁধে তুলে নিতে চায়। সবাই তাকে বারণ করে, 'ওরে পাগল, এত ভার তোর সইবে কেন!' কিন্তু খরগোসের মন মানে না, কাউকে বিপদে পড়তে দেখলেই সাহায্য করার জন্যে ছুটে যায় সে। সিংহের গলায় কাঁটা আটকেছে, বকের কাছে ছুটে গিয়ে অনুরোধ করে সে, 'দে না ভাই কাঁটাটা বের করে, বেচারা সিংহ বড় কষ্ট পাচ্ছে।' তার এই স্বভাব দেখে প্রাণী জগতের অনেকেই ব্যঙ্গ করে তাকে, সাবধান করে দিয়ে বলে, 'দেখিস, একদিন তোকে এর জন্যে ভুগতে হবে।' প্রাণী জগতের দুঃখ-কষ্ট সত্যি এত বেশি, শোকের গভীরতাও মাপা যায় না, কিছু দিনের মধ্যেই হাঁপিয়ে

উঠল খরগোস, তার মনে হতে লাগল এত ভার সত্যি তার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। কিন্তু ওই যে, মনটা তার নরম, কাজেই তার দ্বারা সবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করা সম্ভব নয় জেনেও সাধ্যমত যতটুকু পারে করে যাচ্ছে সে। তারপর একদিন সত্যি সত্যি তার বিপদ হলো। একটা বাঘ আটকা পড়েছে শিকারীর জালে, খবর পেয়ে ছুটে এল খরগোস। বাঘ তাকে অনুরোধ করল, 'দাঁত দিয়ে জাল কেটে আমাকে উদ্ধার কর, ভাই খরগোস। কথা দিচ্ছি, তোকে আমি মারব না।' সরল বিশ্বাসে জাল কেটে বাঘকে মুক্ত করল খরগোস। আর মুক্ত হয়েই স্বমূর্তি ধারণ করল হিংস্র বাঘ। হালুম করে একটা গর্জন ছাড়ল সে, খরগোসকে খেয়ে ফেলার জন্যে হাঁ করে ছুটে এল। বিধির কি বিধান, সে যাত্রা বলতে গেলে অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে গেল খরগোস। শিকারীর আরেকটা ফাঁদ ছিল, ঘাস আর শুকনো পাতা দিয়ে ঢাকা, তাতে পা দিতেই গভীর একটা গর্তের ভেতর পড়ে গেল বাঘ। রাগে ও ভয়ে থরহরি কম্প, তারপরও হাতে-পায়ে ধরে এক পাল শিয়ালকে ডেকে আনল খরগোস। ফাঁদে পড়া বাঘের কান্না তার সহ্য হচ্ছিল না। পরস্পরের লেজ কামড়ে এক লাইনে দাঁড়াল শিয়ালরা, তারপর পিছু হটে ঢাল বেয়ে নিচে নামল লাইনের এক প্রান্তের কয়েকটা শিয়াল, বাকিরা থাকল ঢালের মাথায়। সেই লাইন ধরে গর্ত থেকে উঠে এল বাঘ। বিপদ মুক্ত হয়ে খরগোসের কাছে ক্ষমা চাইল সে, কথা দিল জীবনে কারও সঙ্গে আর কখনও বেঈমানী করবে না। কিন্তু জঙ্গলে বাঘ তো ওই একটাই নয়, আরও অনেক আছে, আছে অন্যান্য হিংস্র প্রাণীও। তাদের দুঃখ-কষ্ট আর শোক দূর করতে গিয়ে বারবার বিপদে পড়তে লাগল খরগোস, এবং একদিন এক হিংস্র প্রাণী মারাত্মক ভাবে আহত করল তাকে। খরগোস বুঝল, এই আঘাতেই তার মৃত্যু হবে। একটা ঝোপের ভেতর চুপ হয়ে পড়ে থাকল সে, প্রবল জ্বরে কাঁপছে, কষ্ট পাচ্ছে খিদে আর ব্যথায়। তারপরও প্রাণী জগতের কথা ভুলতে পারছে না

সে। ঝোপের ভেতর থেকে আজও সে দেখতে পায়, চারদিকে শুধু অনাচার আর অত্যাচার, বৈষম্য আর শোষণ, হিংসা আর বিদ্বেষ। আজও তার ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে সবার সমস্যা ও দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেয়, কিন্তু সে শক্তি আর তার নেই। মৃত্যুর প্রহর গুণছে খরগোস, আর ভাবছে শেষ পর্যন্ত জীবনটা তাহলে ব্যর্থই হলো তার। এক এক করে অতীতের সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে যায়। সারাটা জীবন ধরে প্রাণী জগতের দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করেছে সে, তবু তার দ্বারা অতি সামান্যই উপকার হয়েছে প্রাণীজগতের, কারণ সে ছিল একা, কেউ তাকে সাহায্য করেনি, এমন কি একটু উৎসাহ পর্যন্ত দেয়নি। একটা গভীর হতাশা গ্রাস করল তাকে, ফলে মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল আরও দ্রুত। এই সময় সে তার ঝোপের ভেতর থেকে আরেকটা সাদা খরগোসকে দেখতে পেল, পিঠে একটা ব্যাঙ। ভাল করে তাকাল মুমূর্ষু খরগোস, দেখল ব্যাঙটা কিভাবে যেন আহত হয়েছে, পিঠে করে তাকে কোথাও পৌঁছে দিচ্ছে সাদা খরগোস। মাথা তুলল সে, ঝোপের ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখল একটা ডোবার পানিতে ব্যাঙকে নামিয়ে দিয়ে নিজের পথে ফিরে যাচ্ছে সাদা খরগোস। এরপর একটা হাতি এল তার দৃষ্টিপথে। সামনে দিয়ে ছুটে এল একটা ইঁদুর, দেখতে পেয়ে হাতির পিঠে বসা একটা কাক কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল। সন্দেহ নেই, হাতির পায়ের তলায় পড়ে এখুনি চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাবে ইঁদুরটা। কিন্তু না, একেবারে শেষ মুহূর্তে মাটিতে পা ফেলতে গিয়েও ফেলল না হাতি, তার দয়ায় বেঁচে গেল ইঁদুরটা। মাথা নামিয়ে আবার কাত হলো খরগোস, ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে। তার সমগ্র অস্তিত্বে আশ্চর্য একটা আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারল, তার এতদিনের পরিশ্রম বৃথা যায়নি। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে সে শুনতে পেল সাদা খরগোস, প্রকাণ্ড হাতি, সেই কৃতজ্ঞ বাঘ, একটা শিয়াল ছাড়াও প্রাণী জগতের আরও অনেকে একটা গাছের তলায় বসে সভা করছে। ওর কথাই আলোচনা করছে তারা।

বলছে, 'আমাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত আছে, আমরা সেটা অনুসরণ করব, যতটা পারি দূর করব নিজেদের দুঃখ-কষ্ট।' খরগোসের মনে আর কোন হতাশা নেই, সে উপলব্ধি করল তার জীবন সার্থক হয়েছে। এতদিন একাই সে প্রাণী জগতের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করেছে, আজ সে অক্ষম ও মৃত্যুপথযাত্রী, কিন্তু তবু আনন্দ লাগছে এই জন্যে যে জঙ্গলের ভেতর রেখে যাচ্ছে অসংখ্য অনুসারী। তার অসমাপ্ত কাজ ওরাই একদিন শেষ করবে, দুনিয়ার বুক থেকে একদিন নিঃশেষে মুছে যাবে সমস্ত দুঃখ আর কষ্ট।

পরদিন সকালে স্কুলে যাচ্ছে শাহিন, দেখল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে রেহান। তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ, মুখে আঁচড়ের দাগ, একটা চোখের পাশ ফুলে কালচে হয়ে আছে। 'ওরা শুধু শুধু আমাদের মারল,' শাহিনকে বলল সে। 'ঘড়িটা তো তুইও নিসনি, আমিও নেইনি, নিয়েছে···।' কথাটা শেষ করল না সে।

'কে নিয়েছে তুমি জানো, রেহান ভাই?' জিজ্ঞেস করল শাহিন।

'জানি, কিন্তু নামটা বলা যাবে না,' জবাব দিল রেহান। 'এই তো খানিক আগে তার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। বলছে, তোর এই বিপদে সাহায্য করতে রাজি আছে সে।'

'আমার বিপদ?'

রেহান বলল, 'আচ্ছা, বল দেখি, আমাকে ওরা সন্দেহ করে মারছিল, মাঝখান থেকে তুই কেন নিজের ঘাড়ে দোষ চাপালি? এখন তো কোন কথাই শুনবে না ওরা, ঘড়িটা তোর কাছ থেকে আদায় করতে চাইবে।'

'কি নাম ছেলেটার?'

'তা জেনে তোর দরকার কি,' বলল রেহান। 'তোর ভাগ্য ভাল যে চুরির কথা স্বীকার করেছে সে। এখন তুই যদি বিশটা টাকা দিতে পারিস, ঘড়িটা তোকে দিতে রাজি আছে সে।'

মনে মনে একটা হিসাব করল শাহিন। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে বিশ টাকা জমাতে তার প্রায় দু'মাস লেগে যাবে। তবে যদি ইতিমধ্যে জমানো টাকায় হাত দেয়, মাত্র এক হপ্তা লাগবে। 'ঠিক আছে, দেব,' বলল সে।

শাহিন এত সহজে রাজি হয়ে গেল দেখে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো রেহান। 'সত্যি দিবি তো?'

'দেব। এক হপ্তা পর।'

'তিন সত্যি?'

'বললাম তো দেব, তিন সত্যি।'

হঠাৎ শাহিনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রেহান, তার চোখে কি যেন খুঁজছে। 'কেন রে?' বিড়বিড় করে জানতে চাইল সে। আজ যেন শাহিনকে নতুন এক দৃষ্টিতে দেখছে। 'ঘড়িটা তুই তো আর নিসনি, তাহলে এনামকে সে-কথা বললি না কেন? কেন অন্যের দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে মার খেলি? আবার টাকাও দিতে রাজি হয়ে গেলি···কেন, বল তো?'

'কেন আবার, তোমার সঙ্গে খেলি, তাই···,' বলে আর দাঁড়াল না শাহিন, যেন রেহানের কাছ থেকে পালিয়ে গেল। যতক্ষণ তাকে দেখা গেল, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রেহান।

স্কুলে এসে এনামের সঙ্গে দেখা করল শাহিন, তাকে জানাল, ঘড়িটা পাবে সে, তবে দিন কয়েক অপেক্ষা করতে হবে। এনাম ভুরু কুঁচকে বলল, 'তাহলে তুইই নিয়েছিস?' জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকল শাহিন।

আরও দু'দিন পরের ঘটনা, মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে, ভাই-বোনদের সঙ্গে পড়তে বসেছে শাহিন, এই সময় অপরিচিত ও কান ঝালাপালা করা একটা শব্দ শুনে পরস্পরের দিকে অবাক হয়ে তাকাল ওরা। ড্রইংরুম হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল সবাই, দেখল বারান্দার কিনারায় কে যেন একটা টেবিল ক্লক রেখে গেছে।

পরদিন সকালে এনামদের বাড়িতে ঘড়িটা পৌঁছে দিয়ে এল শাহিন,

ওর সঙ্গে সেজো ভাইও গেল।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেয়ার আগে পর্যন্ত এরকম ঘটনা আরও অনেক ঘটল শাহিনের জীবনে। তার যত বয়েস হচ্ছে নিজের প্রতি অযত্ন আর অবহেলাও সেই সঙ্গে বাড়ছে। কলেজে তাকে সবাই একটাই শার্ট পরে সারা বছর আসতে দেখে। সেটারও না থাকে বোতাম, না থাকে ইস্ত্রি। ইতিমধ্যে মোটা লেন্সের চশমা নিতে হয়েছে তাকে। নাদুসনুদুস ভাবটা অবশ্য আগের মতই আছে, তবে সবার সন্দেহকে অমূলক প্রমাণিত করে যথেষ্ট লম্বা হয়েছে সে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কথাবার্তা ও আচরণে খাপছাড়া বা অসংলগ্ন ভাবটুকুও বাড়ছে।

আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের অপেক্ষায় আছে, পাড়ার বখাটে ছেলেরা শাহিনের মনোযোগ কেড়ে নিল। বয়েসে তারা সবাই ওর চেয়ে বড়। কিভাবে তারা চাঁদা তোলে, কোত্থেকে জোগাড় করে জর্দার কৌটা আর বারুদ, রাজনৈতিক দলগুলো কিভাবে তাদেরকে কাজে লাগায় ইত্যাদি সবই জানা হয়ে গেল তার। সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করল তাকে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার ব্যাপারটা। পাড়ার ও আশপাশের গার্লস স্কুলগুলোর সামনে রোজ নিয়মিত আড্ডা দেয় ছেলেরা। শাহিন শিখল, সঙ্গে গুরুজন থাকলে মেয়েদেরকে বিরক্ত করা রিস্কি। কোন মন্তব্য যদি করতেই হয়, করেই অন্য দিকে তাকাতে হবে, যাতে ধরতে না পারে ঠিক কোন ছেলেটি দায়ী। ছটফটে ও হাসিখুশি মেয়েদের লক্ষ্য করে মন্তব্য করা আসলেই মজার, কারণ ছেলেদের মত তারাও ব্যাপারটা উপভোগ করে, কেউ কেউ পাল্টা মন্তব্যও করে, সাধারণত সেগুলো সরসই হয়। আর মেয়েটি যদি খুব সুন্দরী হয়, ব্যাপারটা বেশি দূর গড়ায় না—কারণ সুন্দরী মেয়েরা অত্যন্ত সতর্ক, যত অশ্লীল মন্তব্যই করা হোক চেহারা দেখে মনে হবে না যে তারা শুনতে পেয়েছে। উত্ত্যক্ত করে আনন্দ পাওয়া যায় মেয়েটি যদি খেপে ওঠে। শাহিনের নতুন বন্ধুরা নিজেদের অভিজ্ঞতা

থেকে জানাল, প্রতিক্রিয়া দেখলেই তারা বুঝতে পারে কোন মেয়েটি নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে, আর তাদেরকে জ্বালাতন করেই সবচেয়ে বেশি মজা পাওয়া যায়। আর মেয়েটি যদি পাল্টা ওদেরকে অপমান করে, ব্যাপারটা ওদের জন্যে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, তার বারোটা বাজাবার জন্যে সবাই মিলে উঠেপড়ে লাগে।

এরকম একটা কঠিন মেয়ের কথা দু'দিন ধরেই আলোচনা করছে ওরা। সবারই এক কথা, মেয়েটিকে তারা দেখে নেবে। দেখতে সে নাকি মোটেও সুন্দরী নয়, কিন্তু এত দেমাক যে মাটিতে পা পড়ে না। শুধু তাই নয়, রীতিমত ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেকে সাহসী প্রমাণ করতে চায় সে।

মেয়েটিকে শাহিনের খুব দেখতে ইচ্ছে করল। এক সকালে ছেলেগুলোর সঙ্গে রাস্তার মোড়ে হাজির হলো সে-ও। সব মিলিয়ে ওরা পাঁচজন। জানা গেল, সেগুনবাগিচা থেকে রিকশা করে আসে মেয়েটা। মিনিট বিশেক অপেক্ষা করার পরই ওদের মধ্যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। একজন বলল, 'হালি আইতাছে!'

'মাগীর পাছায় আজ যদি কইষা একটা লাথি না মারছি তো আমার নাম কাবিল না!'

শাহিনের ইচ্ছে হলো এক ছুটে পালিয়ে যায়। ভাবল, এ আমি কাদের সঙ্গে এসেছি! ঘটনা ঘটতে শুরু করলে মরে যেতে ইচ্ছে করবে ওর।

দু'জন ওরা রিকশার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। থেমে গেল রিকশা। শাহিন দেখল, শিরদাঁড়া খাড়া করে সীটে বসে আছে শ্যামলা একটা মেয়ে, পরনে স্কুল ড্রেস। সে তার ব্যাগটা এক হাতে ধরে আছে, অপর হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে আছে কম্পাসের একটা কাঁটা। তার চেহারা থমথম করছে, কিন্তু চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। মেয়েটিকে শাহিনের দেমাকি বলে মনে হলো না, বরং তার চেহারায় আশ্চর্য একটা সরল ভাব লক্ষ

করল সে। লক্ষ করল, রিকশা থামার পর সরাসরি তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটি।

দু'জন ছেলে রিকশার পিছনের দুটো চাকার বাতাস ছেড়ে দিল। বাকি দু'জন রিকশাঅলার ছাগলদাড়িতে হাত বুলিয়ে আদর করল, বলল, 'চাচামিয়া, ভাড়া নিয়া কাইটা পড়েন। এই মাইয়াডার লগে আমাগো কথা আছে। বাতাস গেছে গা, দুই টাকা বেশি চান।'

রিকশাঅলাকে কি যেন বলল মেয়েটি, তার উদ্দেশে হাতজোড় করে মাথা নাড়ল প্রৌঢ় লোকটা। আর কিছু না বলে ব্যাগ খুলল সে, ন্যায্য ভাড়ার টাকা ক'টা সীটের এক পাশে রাখল, তারপর প্রায় লাফ দিয়ে নেমে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। চিবুক উঁচু হয়ে আছে, তাকিয়ে আছে সোজা সামনে, নির্লিপ্ত চেহারা। বখাটেদের পুরো দলটা তার পিছু নিল।

একজন তালি দিতে শুরু করল, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে গাইছে, 'ওলো বাইদানি, মন ভুলানি, আমার লগে যাইবানি!'

একটা খালি রিকশা পেয়ে উঠে বসল দু'জন, মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে এল রিকশা, লাফ দিয়ে নেমে পড়ল তারা। হেঁটে ফিরে আসছে মেয়েটির দিকে, পথ আগলে। তাদের মধ্যে একজন দু'কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে জানতে চাইল, 'এই যে ম্যাডাম, সেদিন আমাদের জুতা দেখাইলা কোন সাহসে? আমরা তো বুইঝা লইছি এইডা তোমার পিরিতের লক্ষণ। আহো, বিয়া বহি।'

রাস্তার দু'পাশে দোকানগুলোর সামনে অনেক ছেলে, পনেরো থেকে বিশের মধ্যে বয়েস তাদের। এখানে আসার পিছনে সবারই একটা কারণ, মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এদের মধ্যে সব রকম পরিবারের ছেলেই আছে। কেউ লজ্জাটে ভাব নিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে, ঘন ঘন মাথার চুল ঠিক করে, কোন মন্তব্য করতে সাহস পায় না। কেউ কোন মেয়ের সঙ্গে

চোখাচোখি হলেই আড়ষ্ট হাসে। অবহেলা বা নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়ে মেয়েদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চায়, এমন ছেলেও আছে—নিরাসক্ত দৃষ্টিতে মেয়েদের ওপর চোখ বুলায়, বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফোঁকে, চেহারায় বিষণ্নতা ফুটিয়ে রাখার চেষ্টা করে। আর আছে অস্থির কিছু ছেলে, অকারণে ছুটোছুটি করে, চিৎকার করে ডাকাডাকি করে বন্ধুদের, কিংবা কৃত্রিম ঝগড়া বাধায় তাদের সঙ্গে, মেয়েদের দিকে আড়চোখে তাকায়। আরও একদল ছেলে থাকে, যাদের মর্যাদাবোধ বলতে কিছু নেই, ভালবাসা ও সংস্কৃতির স্পর্শ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত, এমন পরিবেশে মানুষ যেখানে নির্লজ্জ ও বেপরোয়া হতে পারাটা গর্বের বিষয়, দুর্বলের ওপর অত্যাচার করাটাকে বীরত্ব বলে মনে করে। যেমন শাহিনের বন্ধুরা।

দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটা, চারদিকে তাকাল। ঘৃণায় ও অপমানে তার চেহারা লাল হয়ে উঠেছে। সে দাঁড়াতেই তার সামনে থেকে ছিটকে সরে গেল ছেলে দুটো। ইতিমধ্যে পিছনের ছেলেগুলো কাছে চলে এসেছে, তাদের একজন বলল, 'ল যাই, শিশুপার্ক আইসক্রীম খাওয়ামু তরে।'

ঝট করে ঘাড় ফেরাল মেয়েটি, এ ছেলে দুটোও ছিটকে দূরে সরে গেল।

সামনে ও পিছন থেকে চারজনই ওরা দূরে সরে গেছে। যত নির্লজ্জ আর বেপরোয়াই হোক, কোন মেয়ের নাগালের মধ্যে কখনোই ওরা থাকে না। জানে, মেয়েটি চিৎকার করতে পারে, হঠাৎ কেঁদে ফেলতে পারে, চোখের পলকে বদলে যেতে পারে পরিস্থিতি। একটা ছুঁতো পেলেই হয়, নিজেকে মেয়েটির বিপদের সময়কার উপকারী বন্ধু প্রমাণিত করার জন্যে বহু ছেলে চারদিক থেকে ছুটে আসবে। নাগালের বাইরে থাকলে পালানো সহজ। ধরা পড়লে মার খেয়ে জান যাবার অবস্থা হবে।

স্কুল পর্যন্ত একশো গজ রাস্তায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল। কাছাকাছি এসে অশ্লীল মন্তব্য করে ওরা, মেয়েটা দাঁড়িয়ে পড়লেই ছিটকে

দূরে সরে যায়।

নিজেকে উদভ্রান্ত লাগছে শাহিনের। কি করা উচিত বুঝতে পারছে না বলেই তার আচরণ উদ্ভট হয়ে উঠল। মেয়েটির পিছনে ছিল সে, তার সঙ্গীরা দূরে সরে গেলেও, নাগালের বাইরে সরে যাবার কথা মনে থাকল না তার। শেষ বার মেয়েটি যখন দাঁড়াল, তার ঠিক পিছনেই রয়েছে সে। মেয়েটির জন্যে কষ্ট হচ্ছে তার, কিছু একটা বলে তাকে অভয় দিতে চায় সে। তাকে পাশ কাটিয়ে এল, দেখল মেয়েটির চেহারায় ভয় বা আতঙ্ক না থাকলেও, চোখ দুটো লাল ও ভেজা ভেজা। বুকটা কেমন যেন করে উঠল তার। সে বলল, 'তুমি ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো কেন?' বলেই বুঝল, ঠিক এ-কথাটি বলতে চায়নি সে। কিন্তু নিজেকে শুধরে নেয়ার আর সময় পাওয়া গেল না। ঠাস করে একটা শব্দ হলো, হু হু করে জ্বালা করে উঠল তার গাল।

সামনে স্কুলের গেট দেখা যাচ্ছে, একটা রিকশা থেকে হেডমিসট্রেসকে নামতে দেখা গেল। তাঁকে দেখেই সাহস বেড়ে গেছে মেয়েটির। চড়টা এত জোরে শব্দ করল, মুহূর্তের জন্যে রাস্তার সমস্ত আওয়াজ ও নড়াচড়া থেমে গেল, গেট ছেড়ে এগিয়ে এলেন হেডমিসট্রেস। 'লিলি, কি হয়েছে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'আপা দেখুন, কয়েকটা ছেলে আমাকে বিরক্ত করছে। রোজই এরা···।'

গালে হাত দিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছে শাহিন। দূর থেকে তার বন্ধুরা চিৎকার শুরু করেছে, 'শাহিন, লৌড় দে! আবে পলা!' কিন্তু তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না সে।

শাহিনের সামনে এসে দাঁড়ালেন হেডমিসট্রেস। ইতিমধ্যে রাস্তার এই অংশ থেকে বাকি সব ছেলেরা সরে পড়েছে, এদিকটা পুরোপুরি ফাঁকা। 'তুমি স্কুলে ঢোকো,' প্রথমেই মেয়েটিকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবার

নির্দেশ দিলেন হেডমিসট্রেস। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে গেটের দিকে এগোল। এবার শাহিনের দিকে তাকালেন তিনি। হেডমিসট্রেস হিসেবে অত্যন্ত কড়া হলেও বখাটে ছেলেদের আর সবার মত তিনিও যমের মত ভয় পান। চাঁদা নিতে এসে এরা এমন কি তাঁকেও বোমা মারবে বলে হুমকি দিতে ছাড়ে না। 'ছি, বাবা, এ-সব কি ভাল কাজ!' শুরু করলেন তিনি। 'রাস্তাঘাটে মেয়েদের বিরক্ত করছ শুনলে তোমার মা-বাবা কি ভাল বলবেন?'

'না,' প্রতিবাদ করল শাহিন, 'আমি ওকে শুধু বলতে চেয়েছিলাম···।'

'কেন তুমি ওকে কিছু বলতে যাবে?' হেডমিসট্রেস বুঝতে পারলেন, ছেলেটা মারমুখো নয়, ফলে কড়া হবার অধিকার ও স্বাধীনতাটুকু নিলেন তিনি। 'রাস্তায় কোন ভদ্রলোকের ছেলে কোন মেয়েকে কখনও বিরক্ত করে? শোনো, আর যেন কখনও তোমাকে স্কুলের সামনে না দেখি। এরপর দেখলে পুলিশে ধরিয়ে দেব।' বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না।

সেদিন শাহিনকে নিয়ে পাড়ায় ফেরার পথে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করছে ওরা চারজন, শুনে শিউরে উঠল শাহিন। সে সিদ্ধান্ত নিল যেভাবেই হোক অপমানিত হওয়া থেকে বাঁচাতে হবে মেয়েটিকে। ওদের আলোচনা থেকে জানা গেল, মেয়েটিকে উত্ত্যক্ত করেই সন্তুষ্ট থাকবে না ওরা, সে যদি নতি স্বীকার করে মাফ না চায় তাকে ওরা বোমা মারবে। মেয়েটিকে বাঁচাতে চায় শাহিন, কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব বুঝতে পারছে না। তার ইচ্ছে হলো মেয়েটির সঙ্গে স্কুলের সামনে নয়, অন্য কোথাও দেখা করে। দেখা করে তাকে সাবধান তো করবেই, সেই সঙ্গে ওর সম্পর্কে তার মনে যে ভুল ধারণাটি জন্মেছে সেটিও ভাঙার চেষ্টা করবে।

দু'দিন চেষ্টা করার পর সেগুনবাগিচায় মেয়েটির দেখা পেল শাহিন। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল সে। রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকল শাহিন,

দেখল একটা বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামল মেয়েটি। রিকশাঅলাকে ভাড়া দিচ্ছে, পা পা করে তার দিকে এগোল শাহিন। রিকশায় থাকতেই তাকে দেখতে পেয়েছে মেয়েটি, তারপর আর ভুলেও তাকাচ্ছে না।

'ইচ্ছে করলে লোকজন ডেকে আমাকে তুমি মার খাওয়াতে পারো,' বলল শাহিন, 'কিন্তু তার আগে আমার একটা কথা তোমাকে শুনতে হবে।'

থমথম করছে মেয়েটির চেহারা, রিকশাঅলার কাছ থেকে বাকি টাকা ফেরত নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল, তারপর ঘুরল। চোখে আগুন নিয়ে তাকাল সে, উঁচু করল হাঁটু, পা থেকে খুলে এক পাটি স্যাণ্ডেল দেখাল। লোহার গেটটা সজোরে বন্ধ হয়ে গেল, ঝন ঝন শব্দ করে কাঁপতে লাগল পাল্লা দুটো।

পরদিন স্কুল বন্ধ, বাড়িতে বসে সারাদিন চিন্তা করল শাহিন। সন্ধের পর পাড়ার ছেলেগুলোর সঙ্গে দেখা করল সে। 'আজ আমি সারাদিন সেগুনবাগিচায় ছিলাম। সাধারণ একটা মেয়ে, ক্লাস নাইনে পড়ে, সে কিনা আমাকে দুনিয়ার লোকের সামনে চড় মারল! আমি প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিলাম।'

একা গেছে বলে সবাই তার ওপর রাগ করল।

তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে শাহিন বলল, 'বিকেলে আমাকে ডেকে একটা চিঠি দিল লিলি।'

'চিঠি দিছে? কই দেহি।'

পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল শাহিন, ছেলেরা সেটা ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করল। কাগজটায় লেখা রয়েছে, 'তোমার বন্ধুদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, সেজন্যে আমি ক্ষমা চাই। আমার বাবা নেই, কোন ভাইও নেই, কাজেই ওরা যদি আমার জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দেয় তাহলে আমাকে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হবে। এই চিঠি লেখার

অবশ্য আরও বড় একটা কারণ আছে। সেটা হলো, রাগের মাথায় না বুঝে তোমাকে চড় মারার পর থেকে আমি অশান্তির আগুনে জ্বলছি। হঠাৎ করেই উপলব্ধি করেছি, ঘৃণা থেকেও মানুষের মনে জন্ম নিতে পারে ভালবাসা। তোমার প্রতি প্রচণ্ড একটা আকর্ষণ আমাকে অস্থির করে রেখেছে। জানি না একেই কি প্রেম বলে? আশা করছি এই চিঠির একটা জবাব তুমি দেবে। ইতি, লিলি।'

চিঠি পড়া শেষ হতেই একসঙ্গে কথা বলে উঠল ওরা। কেউ কেউ খুবই হতাশ বোধ করল, কারণ ওদেরই এক বন্ধুর প্রেমে পড়ে যাওয়ায় এখন তো আর মেয়েটিকে বিরক্ত করা যাবে না। সংখ্যায় ওরাই ভারি, কাজেই যারা এটাকে মেয়েটির আত্মরক্ষার কৌশল বলে অগ্রাহ্য করতে চাইল তারা পাত্তা পেল না। একজন পরামর্শ দিল, 'তুমি মিয়া জুৎসই একটা উত্তর লিইখা ফালাও।'

শাহিন বোকা বোকা চেহারা করে বলল, 'আমি কি উত্তর লিখব। এ-সব ব্যাপার আমি বুঝি নাকি!'

হইহই করতে করতে তাকে নিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল ওরা। শাহিনের পকেটে টাকা নেই, তবু তাকেই চা আর সিঙ্গাড়ার অর্ডার দিতে হলো। চার-পাঁচজন মিলে কিভাবে কি লিখতে হবে বলে দিল, ধীরে ধীরে একটা কাগজে সব লিখে নিল শাহিন।

একজন বলল, 'লিখো—পেরেম করবার চাও বালা কথা, মাগর বেঈমানী করবার পারবা না। মাইনামানুষ হইল গিয়া কচু পাতায় বিষ্টির পানি; খালি পিছলায়। তুমি যে অন্য রহম তার পরমান দেখবার চাই। আর হুনো, আমার বন্ধুগো লগে অহন থে বালা ব্যবহার করবা।'

আরেকজন বলল, 'কও—যুগ বদলাইছে, প্রেম করবার চাইলে নিজেরে মেইলা ধরতে লাগব। এক লগে শো দেহুম, মেলায় যামু, হাত ধইরা কিরসেন্ট লেকে হাঁটুম, বোটানিকাল যামু, ঝোপের আড়ালে বইসা

কিস দিমু···ফুকা পেরেম কইরা লাভ নাই।'

তৃতীয়জন বলল, 'আবে রাখ, এ-সব লিখলে ডরেই ভাগব। তুমি মিয়া লিখো—তুমি আমার জানের জান, কলিজার টুকরা। তোমার বুকের মইদ্যে আমারে এত্তিজারা জায়গা দিয়ো, জীবনডা আমার তাইলে ধন্য অইয়া যাইব।'

পাড়ার রেস্তোরাঁ; ম্যানেজারকে পরে টাকা দেবে বলে বেরিয়ে এল শাহিন। বাড়ি ফেরার পথে দুটো চিঠিই ছিঁড়ে ফেলে দিল নর্দমায়। তার হাতের লেখা বন্ধুরা চিনে ফেলতে পারে, তাই বড় ভাবীকে দিয়ে লিখিয়ে লিলির চিঠি বলে চালিয়ে দিয়েছে সে। গোটা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পর, লিলির বিপদ উপলব্ধি করতে পেরে, তার বড় ভাবী চিঠিটা লিখে দিতে আপত্তি করেননি।

পরদিন সরাসরি লিলিদের স্কুলে হাজির হলো শাহিন। ক্লাস বসে দশটায়, হেডমিসট্রেসের সঙ্গে জরুরী আলাপ আছে বলে দারোয়ানের সঙ্গে ভেতরে ঢুকল এগারোটারও খানিক পরে। হেডমিসট্রেস তাঁর অফিস কামরাতেই ছিলেন। দারোয়ানের সঙ্গে শাহিনকে ভেতরে ঢুকতে দেখে তাঁর চেহারা কঠিন হয়ে উঠল। 'তুমি? আবার?'

'জ্বী। পরশু আমি লিলিদের পাড়াতেও গিয়েছিলাম।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন হেডমিসট্রেস। 'তোমার স্পর্ধা তো কম নয় দেখছি!'

'উত্তেজিত হবেন না,' শান্তসুরে বলল শাহিন। 'আগে আমার কথাগুলো শুনুন। আপনার ছাত্রী লিলি আমাকে ভুল বুঝেছে। তার ভুল না ভাঙা পর্যন্ত আমি স্থির হতে পারছি না। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, আমি ভদ্র পরিবারের ছেলে কিনা।'

শাহিনকে ভাল করে দেখলেন হেডমিসট্রেস, ধীরে ধীরে আবার বসলেন তিনি। 'কেন ভুল বুঝল, ব্যাখ্যা করো।'

প্রথমে নিজের বাড়ির ঠিকানা বলল শাহিন, তারপর জানাল, 'আমাদের পাড়ার কয়েকটা ছেলে এই স্কুলের একটি মেয়েকে কিছুদিন ধরে বিরক্ত করছে, এ-কথা শুনে ওদের সঙ্গে সেদিন আমিও আসি। ওরা যখন অশ্লীল মন্তব্য করছিল, আমার তখন খুব খারাপ লাগে। ওদেরকে বারণ করলে ওরা আমার কথা শুনবে না, তাই লিলিকে আমি অভয় দিয়ে কিছু বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু লিলি আমাকে ভুল বুঝে চড় মারে।'

'এখন তাহলে কি চাও তুমি? লিলি তোমার কাছে ক্ষমা চাইবে?'

'আমি চাই আসল ঘটনাটা আপনার ছাত্রী জানুক। না, ক্ষমা চাইতে হবে না—আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম, এটাকে অপরাধ মনে করা হলে আমার কিছু বলার নেই।'

'ঠিক আছে, লিলিকে আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেব। এখন তুমি যাও।'

মাথা নাড়ল শাহিন। 'জ্বী-না, ওর ভুল ধারণাটা ভেঙেছে কিনা তা আমাকে জানতে হবে। দয়া করে আপনি আমার সামনে তাকে সব ব্যাখ্যা করে বলুন, কিংবা আমাকে বলার সুযোগ দিন।'

আপত্তি জানাতে গিয়েও থেমে গেলেন হেডমিসট্রেস। তারপর একগাদা প্রশ্ন করলেন তিনি—কি করে সে, তার বাবার পরিচয় ও পেশা, ভাই-বোন ক'জন, তারা কি করে ইত্যাদি। অবশেষে লিলিকে ডেকে পাঠালেন।

অফিস কামরায় ঢুকে শাহিনকে দেখেই ঝট করে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল লিলি। শাহিন দাঁড়িয়ে আছে ডেস্কের সামনে, লিলি দাঁড়াল ডেস্কের পাশে, হেডমিসট্রেসের গা ঘেঁষে।

পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করা হলো, হেডমিসট্রেসই ব্যাখ্যা করলেন। সবশেষে তিনি বললেন, 'ভদ্র পরিবারের ছেলে, তুমি ওকে ভুল বোঝায় ওর খারাপ লাগছে। ও কথা দিচ্ছে, ও বা ওর বন্ধুরা তোমাকে আর কখনও বিরক্ত তো করবেই না, রাস্তায় বা অন্য কোথাও দেখা হলে কথা বলারও

চেষ্টা করবে না। তাই না, শাহিন?'

এ-ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি শাহিন দেয়নি, তবু মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল, 'জ্বী। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি, ওরা বলেছে আর কখনও ওকে বিরক্ত করবে না।'

'আমাকে এখন কি করতে হবে?' শাহিনের দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না লিলি, প্রশ্নটাও করল হেডমিসট্রেসকে।

'আসল ব্যাপারটা কি ছিল তা তুমি বুঝতে পেরেছ, এটা বললেই চলবে,' হেডমিসট্রেস জানালেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল লিলি, যেন কিছু বলার ইচ্ছে নয় তার। তারপর গলায় প্রায় তাচ্ছিল্যের ভাব এনে উচ্চারণ করল, 'বললাম। আপা, এখন তাহলে আমি যাই?'

লিলির দিকে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলেন হেডমিসট্রেস, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লিলি, শাহিনের দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়েই।

একটা ফাইল টেনে নিয়ে খুললেন হেডমিসট্রেস, তারপর মুখ তুলে তাকালেন। 'তুমি আর কিছু বলতে চাও?'

শাহিনের বলতে ইচ্ছে করল, আপনার ছাত্রী আমার বক্তব্য বিশ্বাস করেনি অর্থাৎ তার ভুল এখনও ভাঙেনি। কিন্তু আর কথা বাড়ানো উচিত হবে না বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল সে, মন খারাপ করে বেরিয়ে এল অফিস কামরা থেকে। বেরুবার আগে শুধু বলল, 'আমার যদি কোন বেয়াদপি হয়ে থাকে তো মাফ করবেন।'

একটা মেয়ে তাকে ভুল বুঝেছে, এটা একটা অশান্তির কারণ হয়ে থাকল শাহিনের জীবনে। অন্য কোন ছেলে হলে হয়তো ব্যাপারটা ভুলে যেত, কিন্তু শাহিন নয়। চোখের সামনে যেখানে যত ভুল আছে সব দূর

করার চেষ্টা যার জীবনে প্রায় একটা সাধনার মত সেই জ্ঞান হবার পর থেকেই, তার কাছে সামান্য এই ভুল বোঝাবুঝি অসামান্য হয়ে দেখা দিল। তার ভেতর একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জন্ম নিল, সে যে নোংরা মানসিকতার ছেলে নয় এটা লিলিকে একদিন না একদিন বোঝাবেই বোঝাবে সে। তার এই প্রতিজ্ঞা ম্লান হতে পারল না সম্ভবত লিলির সঙ্গে এখানে সেখানে বারবার দেখা হয়ে যাওয়ায়। দেখা হওয়া মাত্রই যে পুরানো প্রসঙ্গটা তুলল বা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্যে উঠেপড়ে লাগল, তা নয়। কারণ সরাসরি আবেদন জানালে যে লিলির মত মেয়ের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাবে না সেটা ভালই বোঝে শাহিন। সে তার আচরণ দিয়ে লিলির সদয় দৃষ্টি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করল। তবে বছরের পর বছর কেটে গেলেও তাতে লাভ হলো না কোনই। তাকে দেখলেই ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নেয় লিলি, তাচ্ছিল্য প্রকাশে দ্বিধা করে না। ফলে শাহিনের অশান্তি শুধু বাড়েই।

শাহিন সচেতন, তার শরীরের ভেতর পরম এক শত্রু বাস করে। সেজন্যেই কারও কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করে না সে। না, এমনকি লিলির কাছ থেকেও তার কিছু চাওয়ার নেই—শুধু তার সম্পর্কে ভুল ধারণাটা ভাঙতে পারলেই সে খুশি। কিন্তু তারপরও লিলি নামের অসম্ভব জেদি মেয়েটা তার জীবনে আশ্চর্য সব পরিবর্তন এনে দিচ্ছে। এখন তাকে বোতাম ছেঁড়া শার্ট পরতে দেখা যায় না, সব সময় সেজেগুজে থাকে। হাঁটাচলায়, কথাবার্তায় স্মার্ট একটা ভাব লক্ষ করা যায়। গা থেকে ভুর ভুর করে দামী সেন্টের গন্ধ ছড়ায়। নিজের এ-সব পরিবর্তন লক্ষ করে শাহিন, তবে কারণটা গুরুত্ব দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে না। সে যে লিলির প্রেমে পড়ে যাচ্ছে, পরিবর্তনের সেটাই যে কারণ, এটা যদি বোঝেও, নিজের কাছে স্বীকার করে না। বরং নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে মনে করিয়ে দেয়, কাউকে ভালবাসা উচিত নয় তার—কাউকে ভালবাসার অধিকারই তার

নেই। আর সেজন্যেই, লিলির ভুল ভাঙানোর চেষ্টা যখন সফল হতে যাচ্ছে, লিলি যখন তার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠছে, নিজেকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে দূরে সরিয়ে আনল শাহিন।

দূরে সরে এল বটে, তবে দূর থেকেও কড়া নজর রাখল লিলির ওপর। বাপ-ভাই বা প্রভাবশালী আত্মীয়স্বজন না থাকলে এই শহরে একটা মেয়ের কোন নিরাপত্তা নেই, বিশেষ করে মেয়েটিকে যদি লেখাপড়া বা অন্য কোন কাজে রোজই বাইরে বেরুতে হয়। লিলি কখন কোথায় যায়, কেউ তাকে বিরক্ত করে কিনা, কি তার সমস্যা, সব খবরই রাখে শাহিন। শুধু খবরই রাখে না, মেয়েটার পথ থেকে সমস্ত বাধা দূর করার জন্যে সাধ্যের অতীত চেষ্টাও করে। আবার সব সময় সতর্ক থাকে, লিলির সঙ্গে যাতে দেখা না হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও দেখা হয় বৈকি। আর তার সামনে পড়লেই অকারণে গাম্ভীর্য দেখায় শাহিন, দেখেও না দেখার ভান করে, অবহেলা বা তাচ্ছিল্য প্রকাশেও কুণ্ঠিত হয় না। সে বুঝতে পারে তার ব্যবহারে অবাক তো হয়ই লিলি, আহতও হয়। মনে মনে তাকে সে বলে, 'দূরে সরে থাকো, ভুলেও কাছে এসো না···।'

লেখাপড়ায় সব সময়ই ভাল সে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজিতে এম. এ. পাস করল বেশ ভালভাবেই, পরম শত্রুটি দিনে দিনে খুব বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করা সত্ত্বেও। তারপর, কোন প্রয়োজন বা ভবিষ্যৎ নেই জেনেও, কর্মজীবনে প্রবেশ করল শাহিন—আমদানি ব্যবসায় নেমে পড়ল। অর্থাৎ তার সেই পুরানো পাগলাটে স্বভাব এখনও খানিকটা রয়ে গেছে।

পাড়ার এক ভদ্রলোক মারা গেছেন, তাঁকে মাটি দিয়ে আজিমপুর কবরস্থান থেকে বাড়ি ফিরছে শাহিন। আসার সময় সবার সঙ্গে ট্রাকে চড়ে এসেছিল, ফেরার সময় একা হেঁটে ফিরছে। মাথায় হঠাৎ একটা চিন্তা ঢুকেছে, সেজন্যে অন্যমনস্ক। চিন্তাটা হলো, কবরে মানুষকে চিৎ করে কেন

শোয়ানো হয়? তার মনে হলো, মানুষ তো স্বর্গ চেনে না, নরক চেনে না, চেনে এই পৃথিবীটাকে, যেখানে সে জন্মেছে। যে লোক এই মাটির বুকে জন্মাল, সে তো পৃথিবীটাকে ভালবেসেছিল, ভালবেসেছিল পরম বন্ধুর মত, সেই বন্ধুকে চির আলিঙ্গনে আবদ্ধ করার সুযোগ কেন তার থাকবে না? তাছাড়া, মরার পর যদিও আরাম বা সুযোগ-সুবিধের প্রশ্ন নেই, তবু চিৎ হয়ে শোয়া তো একটা আড়ষ্ট ভঙ্গি, তাই না? জ্যান্ত মানুষরা জানে উপুড় হয়ে শুলে পেশীতে ঢিল দেয়া সহজ হয়, বিশ্রাম নিতে তাতেই বেশি সুবিধে। উপুড় হয়ে শোয়ার মধ্যে আত্মসমর্পণের একটা ভাবও আছে। তাহলে সেভাবেই কেন তাকে শোয়ানো হয় না? ধর্মীয় বিধান কি বলে?

হঠাৎ একটা শোরগোল আর ছুটোছুটি শুরু হওয়ায় চিন্তায় বাধা পড়ল। ইতিমধ্যে আজিমপুরের মোড়ে চলে এসেছে শাহিন। দেখল বাস থেকে নেমে একদল লোক কাকে যেন ধাওয়া করছে। চোখের পলকে ভিড় জমে গেল, জানা গেল একজন পকেটমার ধরা পড়েছে।

আরও অনেকের সঙ্গে ছুটে ভিড়টার কাছাকাছি চলে এল শাহিন। কে পকেটমার অর্থাৎ কে মার খাচ্ছে দেখার উপায় নেই, তবে যারা মারছে তাদের অনেককেই দেখতে পাচ্ছে শাহিন। এরকম ঘটনা আগেও ঘটতে দেখেছে সে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার মস্তিষ্ক ও মন আলাদাভাবে কাজ শুরু করে দেয়।

এ-ধরনের প্রথম ঘটনাটা চাক্ষুষ করেছিল বছর তিনেক আগে মীরপুর এক নম্বর সেকশনের বাসস্ট্যাণ্ডে। কোস্টারে বসে আছে শাহিন, সীট একটাও খালি নেই, আরও লোক নেয়ার অপেক্ষায় স্টার্ট দিচ্ছে না ড্রাইভার। বাইরে হঠাৎ শোরগোল আর ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। পাশে বসা ভদ্রলোকের ওপর ঝুঁকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল শাহিন, দেখল একজন পকেটমার গণপিটুনি খাচ্ছে। মারতে মারতে প্রায় আধমরা করে ফেলে রাখা হলো রাস্তার পাশে। মিনিট তিন-চার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়ে

এল, কোস্টারে উঠল সুবেশী ও স্বাস্থ্যবান এক তরুণ। দেখামাত্র ছেলেটির ওপর দৃষ্টি আটকে গেল শাহিনের। শুধু কাপড়চোপড়ে নয়, চেহারা ও হাবভাবও বলে দেয় ভদ্র পরিবারের মার্জিত ছেলে সে। সীট না পেয়ে শাহিনের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকল, তারুণ্যসুলভ আগ্রহ ও কৌতূহল নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। কয়েক সেকেণ্ড পর আরও চারজন তরুণ উঠল বাসে, তাদের মারমুখো তাগাদায় ড্রাইভার এবার কোস্টার ছেড়ে দিল। এই তরুণদের চেহারা বা কাপড়চোপড়, আচরণ বা হাবভাব কোনটাই মার্জিত তো নয়ই, স্বস্তিকরও নয়। কোস্টার ভর্তি লোকজনের সামনে টাকার বখরা নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিল তারা, শাহিনের পাশে দাঁড়ানো তরুণটির সঙ্গে। ঝগড়ার মধ্যে 'তাফালিং' থেকে শুরু করে 'ছিল্লা লবণ মাখায়া দিমু' পর্যন্ত সব ধরনের প্রচলিত স্ল্যাং বিনিময় হতে লাগল. আর অশ্রাব্য খিস্তির তো কথাই নেই। মার্জিত তরুণ, যাকে দেখে মনে হয়েছিল সুকুমারবৃত্তির চর্চা করে, সবার চেয়ে বিশ টাকা বেশি নেয়ার জন্যে প্রথমে কাকুতিমিনতি, পরে তর্জন-গর্জন শুরু করে দিল, এমন ভাষা ও ভঙ্গিতে যে শাহিনের বমি পেয়ে গেল, মনে হলো কেউ যেন তার গায়ে ঝাঁটা মারছে। ওদের কথা থেকে জানা গেল, বাসস্ট্যাণ্ডে কোস্টার মালিকদের যে-সব পোষা গুণ্ডা থাকে তারাই গণপিটুনির সময় পকেটমারের কাছ থেকে টাকাগুলো ছিনিয়ে নেয়, যদিও সে টাকা তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করতে পারেনি, কারণ 'শিক্ষিত মস্তান' অর্থাৎ 'ছোট ভাইরা' অর্থাৎ ছাত্ররা অকস্মাৎ হাজির হয়ে হাত পাতলে সবই তাদেরকে দিয়ে দিতে হয়েছে। টাকা ভাগের সময় ঝগড়ার মধ্যে পাঁচজনই ওরা কয়েকবার করে পরস্পরের মা-বোনের সঙ্গে শুলো, কেউই তাতে কিছু মনে করল না, কারণ ওদের কথা থেকেই জানা গেল ওদের মা-বোনেরা সবাই নাকি এ-কাজে অভ্যস্ত।

এরপর থেকে পকেটমার বা ছিনতাইকারী ধরা পড়লেই দাঁড়িয়ে পড়ে

শাহিন, গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করে কারা তাদেরকে মারছে। অনেক সময় পকেটমারকে মারে তাদেরই সহকারী বা সঙ্গীরা, আসলে মারার ভান করে বাঁচাতে চেষ্টা করে তাকে। তারপর পুলিশ আসে, রক্তাক্ত পকেটমারকে নিয়ে দূরে সরে যায়, সঙ্গীরা টাকা দিতে পারলে ছেড়ে দেয় তাকে। পকেটমারের দুর্ভাগ্য, যদি সে বাস থেকে ওঠা-নামার সময় ধরা পড়ে যায়। বাস বা কোস্টারের আরোহীরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর, শুরু হয়ে যায় গণপিটুনি।

এই গণপিটুনি ব্যাপারটা প্রথমে ঠিক বুঝত না শাহিন। সমাজের প্রায় সর্বস্তরের লোককে এতে অংশগ্রহণ করতে দেখেছে সে। জীবনে কখনও কাউকে একটা চড়ও মারেনি, এমন লোকও পকেটমার ধরা পড়লে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায়, অন্তত একটা কিল বা লাথি না মেরে ছাড়ে না। সুবেশী, সুদর্শন, শিক্ষিত লোকদেরও দেখেছে শাহিন, পকেটমারকে মারার জন্যে কী ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে ওঠে। অপরাধ যত বড়ই হোক, একজন লোককে সবাই মিলে মারতে মারতে মেরে ফেলবে, এটা কিভাবে সম্ভব বুঝতে পারে না সে। তার মাথা লোকগুলোর চরিত্র বিশ্লেষণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, আর মনটা কাঁদতে থাকে—যে লোকটা নিষ্ঠুরতার শিকার তার জন্যে তো বটেই, যারা তাকে মারছে তাদের জন্যেও।

মানুষ কেন নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়, এ-সম্পর্কে সমাজ ও মনোবিজ্ঞানীদের দেয়া অনেক ব্যাখ্যা পড়েছে শাহিন, সেগুলো তার আংশিক সত্যি বলে মনে হয়েছে। মানুষের ভেতর পশুত্ব আছে, কোন সন্দেহ নেই; সে তার ব্যর্থতার জ্বালা মেটানোর জন্যে হঠাৎ নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে, সত্যি। এ-ও সত্যি যে অন্য কারও কাছে নিগৃহীত বা অপমানিত হয় মানুষ, তার ওপর প্রতিশোধ নিতে না পেরে দুর্বল কাউকে পেলে তাকে ছাড়ে না। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে কি আর কিছু নেই, এটাই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা? ব্যাপারটা কি শুধু একজনের ওপর রাগ আরেকজনের ওপর

ঝাড়া? শুধু প্রতিশোধ?

শাহিনের তা মনে হয় না। তার মনে হয়, এ প্রতিশোধ তার নিজের ওপর, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত ও আত্মপীড়নও বটে, সেই সঙ্গে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণিত করার একটা প্রবণতাও কাজ করে। সে ভাবে, এ এক অদ্ভুত জগতে বাস করছি আমরা যেখানে বেঁচে থাকার জন্যে প্রতি পদে নিজেকে ফাঁকি দিতে হয়, অপরাধ না করে উপায় দেখতে পাই না, তারপর যতভাবে সম্ভব চেষ্টা করতে হয় সেটাকে চেপে রাখার। যে লোকটা কারও পকেট কাটল সে অবশ্যই অপরাধী, কারণ সে ধরা পড়েছে। কিন্তু তাকে যারা মারল, তারা কি নিরপরাধ? নিরপরাধ শুধু এই অর্থে যে বলা যায় তাদের অপরাধ ধরা পড়েনি। অবশ্যই তাদেরকেও কাউকে ঠকাতে হয়, করতে হয় অন্যায় কাজও। পকেটমারকে নয়, মানুষ আস্‌লে আঘাত করে নিজেকে, এ তার নিজের অপরাধবোধের বহিঃপ্রকাশ, তার ভেতর যে অশুভ আর অন্যায়ের বিপক্ষে একটা শক্তি বা সত্তা আছে এ তারও প্রমাণ বহন করে। মানুষের এই সত্তাটি অভিন্ন, সে একজনই, একটাই অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

গোটা মানবজাতি যে অখণ্ড সত্তার অধিকারী, এ-ব্যাপারে শাহিনের মনে কোন দ্বিধা নেই। তার এই বিশ্বাসের নিরিখে দেখলে বলতে হবে যখন দেখা যায় মানুষ অন্যের উপকার বা শুভ কোন কাজ করছে তখন আসলে সে নিজেরই উপকার বা মঙ্গলসাধন করছে, যখন অন্যায় অপরাধ করছে তখন নিজেরই ক্ষতি করছে। আর নিজের ক্ষতি করার প্রবণতা তার ভেতর এত বেশি, শাহিন ভাবে, মানুষ কি তাহলে শাস্তি ভোগের একটা মেয়াদ কাটাচ্ছে এখানে? নিজেকে পীড়ন করাই কি তার নিয়তি? নাকি এক অসম্ভব বৈরী পরিবেশে বিশুদ্ধ হবার কঠিন পরীক্ষা চলছে তার?

তারপর চিন্তা করে, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ঢেলে দিলেও একজন মানুষের দাম মেটানো যায় না। তার প্রাণ, মন, মাথা, চোখ, কান, সবই

একেকটা অমূল্য সম্পদ, এই সব সম্পদ জন্মসূত্রে পেয়েছে সে, অন্য কোনভাবে অর্জন করা সম্ভব হত না। সে অর্থে মানুষ কী আশ্চর্য রকম ভাগ্যবান ও শক্তিশালী। অথচ তার অসহায়ত্বেরও কোন শেষ সীমা নেই। জন্মসূত্রে এত কিছু পেয়েছে বলেই কি তার আকাঙ্ক্ষা মাত্রা ছাড়ায়, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাস্তবতার সম্মিলন ঘটে না বলেই কি নিজেকে তার অসহায় লাগে।

শাহিনের ব্যক্তিগত উপসংহার এরকম: মানুষের জন্ম ও মৃত্যু নেই, তার নিজের সত্তার সঙ্গে ঈশ্বরের সত্তার সম্মিলন ঘটার প্রক্রিয়া চলছে। যেটাকে জন্ম ও মৃত্যু বলা হচ্ছে তা আসলে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাবার ঘটনা, বিভিন্ন স্তরে রেখে মানুষকে সুযোগ দেয়া হচ্ছে বিশুদ্ধ হবার। আর মানুষ শুধু বিশুদ্ধ হতে পারলেই চিনতে পারবে নিজেকে, উপলব্ধি করবে তাকে তৈরি করা হয়েছে আনন্দের একটা অফুরন্ত উৎস হিসেবে। বিশুদ্ধ মানুষ কখনও অসহায়বোধ করবে না, কারণ তার মাত্রা ছাড়ানো আকাঙ্ক্ষাও তখন পূরণ হবার পথে কোন বাধা থাকবে না।

আজিমপুরের মোড়ে পকেটমারকে তারা মারছে দেখে তার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল, কবরে মানুষকে কিভাবে শোয়ানো উচিত সে চিন্তা বাদ দিয়ে ভিড় লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। গণপিটুনিতে সে-ও অংশ নিতে চায়, এরকম একটা ভাব দেখিয়ে আহত লোকটাকে আড়াল করার চেষ্টা করল সে, ফলে পিটুনি কিছু নিজেকেও খেতে হলো তার।

এর আগেও দু'জন পকেটমারকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে শাহিন। তাদের মধ্যে একজন ছিল প্রৌঢ়, তাকে হাসপাতাল থেকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এসে মালীর কাজও করতে দিয়েছিল। দু'দিন পর কোদাল, হোস পাইপ, বালতি ইত্যাদি চুরি করে পালিয়ে যায় লোকটা। খবরটা শুনে হাসতে হাসতে দম আটকে মারা যাবার অবস্থা হয়েছিল শাহিনের। এর মধ্যে হাসির কি আছে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারত না

সে, কারণটা তার মা-বাবা-ভাই-বোনেরাও বুঝতে পারেনি, যদিও তারাও তার সঙ্গে হেসেছিলেন, প্রায় পাল্লা দিয়ে। পরিবারটি সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলার বোধহয় দরকার করে না।

আহত লোকটাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হলো, যদিও নিজের কোন চিকিৎসা না করে সোজা বাড়ি ফিরে এল শাহিন। রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরলে কি লাভ জানে সে, আদর পাবার লোভটুকু ছাড়তে পারে না। বাড়ি ফেরার পর তার প্রত্যাশা মতই সব কিছু ঘটল।

তেমন গুরুতর কিছু না, শুধু এক দিকের ঠোঁটের কোণ সামান্য কেটে গেছে, আর গলার পাশে ছোট একটা আঁচড়ের দাগ। শার্টের একটা বোতাম ছিঁড়েছে, প্যান্টে সামান্য রক্ত লেগেছে, যদিও তার নয়। কোন হইচই না, এমনকি তেমন কোন প্রশ্নও করা হলো না শাহিনকে, তার নিজের ঘরে সে ঢুকতেই বাড়ির সবাই ভিড় করল তার চারধারে, কারও হাতে ডেটলের শিশি, কারও হাতে তুলো, কেউ নিয়ে এসেছে নতুন একটা শার্ট। গরম পানি এল একটু দেরিতে, নিয়ে এলেন ওর মেজো ভাবী। তিনিই ডেটল আর গরম পানি দিয়ে ঠোঁটের কোণটা পরিষ্কার করলেন। কাজটা করার সময় শাহিনের দিকে একটু বেশি ঝুঁকলেন তিনি, সম্ভবত নিজের অজান্তেই। শাহিনের নাকে-মুখে মেজো ভাবীর শাড়ি ও ব্লাউজ বার কয়েক ঘষা খেলো। শুশ্রূষা করার পর দেওরের মাথার চুল আরও খানিক এলোমেলো করে দিলেন তিনি, তারপর চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দিলেন। মেজো ভাবীকে আরও কাছ থেকে অনুভব করতে পারল শাহিন।

সন্ধ্যার পর দরজা বন্ধ করে মেজো ভাইকে রাজশাহীতে চিঠি লিখল শাহিন। লিখল, 'আপনিই না একদিন বলেছিলেন, সদ্য বিয়ে করা বউকে দেশে রেখে মধ্যপ্রাচ্যে যারা চাকরি করতে যায় তারা শুধু দুর্ভাগা নয়, বোকাও? কিন্তু আপনি কি করছেন? সময় থাকতে সাবধান হোন, কারণ আপনার স্ত্রীটি অসাধারণ সুন্দরী।'

দিন পনেরো পর আরেক সন্ধ্যায় হাত ধরে নিজের ঘরে শাহিনকে নিয়ে এলেন মেজো ভাবী, দরজা ঠেলে দিয়ে খাটের ওপর নিজের পাশে বসালেন দেওরকে, বললেন, 'চলতি মাসেই, বোধহয় শেষের দিকে, তোর ভাই নিতে আসছে আমাকে। তোকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

'আমি? রাজশাহীতে যাব? কেন?' আকাশ থেকে পড়ল শাহিন।

'তোর ভাই তো সারাদিন ভার্সিটি আর লাইব্রেরিতে পড়ে থাকবে, আমার সময় কাটবে কিভাবে? তুই তো জানিসই, আমি অসাধারণ সুন্দরী—আমার একটা পুরুষ সঙ্গী দরকার না?'

বোকার মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল শাহিন।

মেজো ভাবী এক হাতে খপ করে ওর কান চেপে ধরে অপর হাতের মুঠো খুললেন। 'এটা কি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

শাহিন দেখল মেজো ভাইকে লেখা তার চিঠিটাই ভাবীর হাতে। মেজো ভাইয়ের ওপর রাগ হলো তার, ভাবল কোন বুদ্ধিতে চিঠিটা তিনি ভাবীকে ফেরত পাঠিয়েছেন? 'মাফ করে দাও, ভুল হয়ে গেছে···,' ইত্যাদি বলে রেহাই পাবার চেষ্টা করল সে।

'ওরে গর্দভ, তোকে তাহলে আদর করাও যাবে না?' কান ছেড়ে দিয়ে মেজো ভাবী শাহিনের পিঠে কষে একটা ঘুসি মারলেন। 'তোর জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, ব্যাপারটা তোর জন্যে বুমেরাং হয়েছে। তোর ভাই তোর বিয়ে দেয়ার কথা ভাবছে। সেই মেয়েটার খবর কি জানতে চেয়েছে। সেই যে, ছ'সাত বছর ধরে যার মন জয় করার সাধনা করছিস। লিলি। তোর সাধনা কত দূর এগোল? সিদ্ধিলাভ করতে আর কতদিন বাকি?'

শাহিন বলল, 'আমি তার মন জয় করার চেষ্টা করিনি। চেষ্টা করেছি ভুল ভাঙাবার।'

'আচ্ছা বেশ, তাই। তা তার শেষ খবর কি?'

'অনার্স পরীক্ষা দিয়ে একটা ইণ্ডেটিং ফার্মে চাকরি করছে,' জানাল

শাহিন, 'কাজ শেখার জন্যে। ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে নিজেই ব্যবসা শুরু করবে।'

'দেখা যাচ্ছে প্রায় একই পথে এগোচ্ছিস তোরা। তুই ইমপোর্ট লাইনে ঢুকেছিস, মেয়েটা ঢুকেছে ইণ্ডেন্টিং-এ। বেশ, বেশ। তা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারটা মিটল তোদের?'

'না। আমাকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়,' মিথ্যে কথা বলল শাহিন, বলেই হেসে ফেলল।

ভুরু কুঁচকে তাকালেন মেজো ভাবী। 'এটা তো দুঃসংবাদ, তুই হাসছিস কেন?'

হাসতে হাসতেই বলল শাহিন, 'তুমি যদি ওর মুখ ঘুরিয়ে নেবার ধরনটা দেখতে। কেউ যেন একটা বোতাম চাপ দেয়, অমনি ঝট করে অন্য দিকে ঘুরে যায় মুখটা, তারপর আর আমার দিকে একবারও ফেরে না।'

'কথা বলার চেষ্টা করে দেখেছিস?'

'বহুবার। ওদের অফিসে তো প্রায়ই যেতে হয় আমাকে। তাকায়ও না, কথাও বলে না। সাংঘাতিক জেদি মেয়ে।'

'তারমানে বলতে চাইছিস, তোর কোন আশাই নেই?'

শাহিন বলল, 'আমাকে খেপাবার চেষ্টা করে লাভ হবে না। লিলির সব কথা তোমাদেরকে আমিই বলেছি। একটাই উদ্দেশ্য আমার, আমার সম্পর্কে ওর ভুল ধারণাটা ভাঙা। এর মধ্যে আর কিছু নেই।'

'আমার গা ছুঁয়ে বল তো, ওকে তুই ভালবাসিস না?' মেজো ভাবীর চোখে সন্দেহ ও অবিশ্বাস।

শাহিন উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'ভালবাসা আছে, তবে আমার সঙ্গে নয়, অন্য একটি ছেলের সঙ্গে। শুনছি খুব তাড়াতাড়ি ওরা বিয়ে করে ফেলবে।'

'সর্বনাশ! কে ছেলেটা?'

'তুমি চিনবে না। বিরাট ধনী, দেখতেও রাজপুত্র। নামটা···আসিফ ইকবাল।'

'তাহলে আর অপেক্ষা করে কি লাভ, আমরা বরং তোর জন্যে অন্য পাত্রী দেখি।'

শাহিন বলল, 'প্রশ্নটার উত্তর আমি তোমার নাগালের বাইরে গিয়ে দিতে চাই,' বলে, মেজো ভাবী বাধা দেয়ার আগেই, খাট থেকে নেমে দরজার কাছে চলে এল সে। দরজা খুলে দৌড় দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে নিয়ে আবার বলল, 'কেন, পাত্রী দিয়ে কি হবে? তুমি না বলছিলে তোমার একজন দরকার?' তারপর চোখের পলকে হাওয়া।

দেওর আর ভাবীর মধ্যে এই যে হাস্য-রসাত্মক ব্যাপারটা ঘটে গেল, এর সবটুকুই আসলে প্রহসন—নির্মম একটা সত্যকে ভুলে থাকার চেষ্টা। দুজনেরই জানা আছে, শাহিন কোনদিনই কোন মেয়েকে ভালবাসবে না—যদি ভুল করে কাউকে ভালবেসেও ফেলে, সে ভালবাসার কোন পরিণতি থাকবে না।

তিন

লিলির প্রতিজ্ঞা, যেভাবে হোক বাবার স্বপ্ন পূরণ করবে ও। সব মেয়েই তার বাবাকে ভালবাসে, তবে বাবার প্রতি লিলির ভালবাসা আর সবার চেয়ে আলাদা। মাটির বুকে যে মানুষটির আর কোন অস্তিত্বই নেই, যিনি

বেঁচে আছেন শুধু মধুর ও তিক্ত কিছু স্মৃতির ভেতর, এখনও তিনিই ওর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। লিলি অনুভব করতে পারে বাবা এখনও ওকে সেই আগের মতই ভাল বাসেন, তিনিই ওর জীবনটা নিয়ন্ত্রণ করছেন, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন নির্দিষ্ট একটা গন্তব্যে, সমস্ত আপদ-বিপদ থেকে সারাক্ষণ রক্ষা করছেন ওকে।

ওর মা দেখতে ভাল না, ছোটখাট কালোমানুষ; কিন্তু বাবা ছিলেন দারুণ সুপুরুষ ও সুদর্শন। এক মায়াভরা চোখ দুটো ছাড়া বাবার কিছুই পায়নি সে, আর মায়ের তরফ থেকে একেবারেই কিছু পায়নি—গায়ের রঙটি ফর্সা নয়, গর্ব করার মত লম্বা হয়নি, এমনকি চুলটাও বাহারি কোন ব্যাপার না।

ছোটখাট একটা চাকরি করতেন তিনি, মীরপুরে প্রায় বস্তির মত জায়গায় একটা কামরা ভাড়া করে থাকত ওরা। অভাব ছিল, ছিল অনিশ্চয়তা আর দুঃখ-শোক, তবে আত্মমর্যাদা নিয়ে জীবনযাপনের ইচ্ছেটা মরে যায়নি, মরে যায়নি সুখী সচ্ছল হবার স্বপ্নটা। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করার প্রবল ইচ্ছে ছিল তাঁর। প্রায়ই বলতেন, 'আর্থিক দীনতা একটা অভিশাপ, এই অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে।'

বাবার প্রিয় খেলনা ছিল লিলি। অফিস থেকে ফিরে কাপড়চোপড় ছাড়তেন না, মেয়েকে নিয়ে মেতে উঠতেন আনন্দ উৎসবে, দেখে মনে হত তিনিও লিলির সমবয়েসী ছোট্ট খোকা বনে গেছেন। মেয়েকে কাঁধে চড়িয়ে কোনদিন চলে যেতেন চিড়িয়াখানায়, কোনদিন কোস্টারে চড়ে ঘুরে আসতেন শিশুপার্ক থেকে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন, মুহূর্তের জন্যেও লিলিকে দৃষ্টির বাইরে থাকতে দিতেন না। একটা কথা মনে পড়লে এখনও লজ্জা পায় লিলি। ওদের বাথরুমটা ছিল বাড়ির শেষ প্রান্তে, ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে। রাত হোক দিন হোক, মেয়ে যতক্ষণ না বেরিয়ে আসে ততক্ষণ বাথরুমের দরজার পাশে ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন—ওর মা

নয়, বাবা। ওদের টেলিভিশন ছিল না, লিলি জেদ ধরত বাড়িঅলাদের ঘরে নাটক দেখতে যাবে। সাদা কাপড় ও কেরাসিন কাঠের বাক্স সাজিয়ে ঘরের ভেতরই একটা টেলিভিশন তৈরি করতেন ওর বাবা, ওর মাকে নিয়ে অভিনয় করতেন, কখনও গান গাইতেন, সে-সব অনুষ্ঠানের একমাত্র দর্শক ছিল লিলি। ওর মাকে প্রায় চিররুগ্নই বলা যায়, বিশেষ করে হাঁপানিটা তখনও খুব কষ্ট দিত। তাঁর হাপানি বাড়লে ভয় পেত লিলি, সেজন্যে মায়ের পাশ বা মাঝখানে না শুয়ে বাবার পাশে শুত ও, সারাটা রাত লেপ্টে থাকত বাবার বুকে।

লিলির বয়েস যখন পাঁচ বছর, দেশে শুরু হলো দুর্ভিক্ষ। জিনিস-পত্রের দাম আগুন হয়ে উঠল, বেতনের টাকায় সংসার চালাতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখলেন লিলির বাবা। অভিশাপ মুক্ত হয়ে সুখী সচ্ছল হবার আকাঙ্ক্ষায় নয়, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে চাকরির পাশাপাশি ব্যবসা শুরু করলেন তিনি। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল লিলির তিন কাকা।

বিয়ে করতে অনেক দেরি করে ফেলেন লিলির বাবা, কারণ ভাই-বোনদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার দায়িত্বটা একা তাকেই পালন করতে হয়েছিল। দেশের জমিজমা বিক্রি করে বোনদের বিয়ে দিয়েছেন, ভাইরাও সবাই চাকরি বা ঠিকাদারি করছে। চোখ ধাঁধানো না হলেও সবারই অল্পবিস্তর উন্নতি ঘটছে, এটা দেখে বিয়ে করার পর লিলির বাবার ধারণা হয়েছিল ভাইরা তাঁকে দৈন্য অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্যে এগিয়ে আসবে। কিন্তু তা তারা আসেনি। এমন কি বড় ভাই ও ভাবীর খুব একটা খোঁজখবরও তারা রাখত না। লিলির বাবার মনে একটা অভিমান জন্ম নেয়, যদিও এ-ব্যাপারে কোন অভিযোগ তিনি কখনোই করেননি।

সংসার চালাতে অপারগ হয়ে ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেন তিনি, তাঁকে অবাক করে দিয়ে তিন ভাইই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। এতদিন তাদেরকে ভুল বোঝায় মনে মনে লজ্জিত হলেন লিলির বাবা।

বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বললেন, 'আমারই তো আপন ভাই ওরা, জানে কি কষ্ট করেই না মানুষ করেছি আমি ওদের—না গো, ওরা আমাকে ভুলে যায়নি।'

শুধু মুখে নয়, টাকা-পয়সা দিয়ে সত্যি তারা তাঁকে সাহায্য করল। স্ত্রীর সামান্য যে গহনা ছিল তা বিক্রি করে, এখান সেখান থেকে ধার-কর্জ করে তিনি নিজেও হাজার পাঁচেক টাকা যোগাড় করলেন। শুরুতে ব্যবসায় তেমন একটা সুবিধে করতে পারলেন না, দেখা গেল পুঁজি বাড়াতে না পারলে লাভের মুখ দেখা সম্ভব নয়। একটা ইনডেন্টিং ফার্মে চাকরি করেন তিনি, আমদানি ব্যবসার সব রহস্য তাঁর জানা। শুধু পুঁজির অভাবে তাঁর ব্যবসায়িক জ্ঞান কোন কাজে আসছে না। আবার তিনি ভাইদের কাছে গেলেন, পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করে বোঝালেন তাদের। প্রথমবার তারা তিন জন মিলে পনেরো হাজার টাকা দিয়েছিল, বড় ভাইয়ের যুক্তি মেনে নিয়ে মাথা পিছু আবার পাঁচ হাজার টাকা দিল। ঠিক হলো, লাভের অংশ সমান চার ভাগে ভাগ হবে। বড় ভাইয়ের বিনিয়োগ মাত্র পাঁচ হাজার টাকা হলেও, ব্যবসার পিছনে শ্রম দেয়ার কারণে তিনিও ওদের সমান ভাগ পাবেন।

সামনে ঈদের বাজার, মধ্যপ্রাচ্যর একটা দেশ থেকে খেজুর আর খোরমা আমদানি করা হলো। এতদিনে কপাল ফিরল, এক লাফে বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেল তাদের পুঁজি। সেই শুরু, তারপর শুধুই সাফল্যের ইতিহাস। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফুল টাইম ব্যবসায়ী বনে গেলেন তিনি। ভাল লাভ হচ্ছে দেখে তার ভাইরাও নিজেদের চাকরি বা ব্যবসা ছেড়ে দিল। মতিঝিলে বিশাল অফিস ভাড়া করা হলো, অফিসে বসানো হলো একাধিক টেলিফোন, টেলেক্স আর ফ্যাক্স। বিশ-পঁচিশজন লোককে চাকরি দেয়া হলো। চার ভাই মিলে শুরু করল জমজমাট ব্যবসা।

কিভাবে যে দুটো বছর কেটে গেল, শত ব্যস্ততার মধ্যে কেউই তেমন খেয়াল করেনি। ইতিমধ্যে ওদের ব্যবসার অনেক শাখা-প্রশাখা গজিয়েছে।

আমদানির দিকটা বড় ভাই যেমন দেখতেন এখনও তেমনি দেখছেন, তবে শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটা দেশের সঙ্গে ব্যবসা করছেন তিনি। অন্যান্য দেশ থেকে আমদানির দিকটা দেখছে ওদের সবার ছোটজন। শুধু আমদানি নয়, ইনডেন্টিং-ও শুরু করেছে ওরা, সেটা দেখাশোনা করছে মেজো ভাই। আর সেজো ভাই নতুন একটা শাখার দায়িত্বে আছে, যে শাখা শুধু রফতানি ব্যবসা সামলায়।

দু'বছর পার হয়ে যাচ্ছে, এবার মালিকানা সম্পর্কে লিখিত একটা দলিল তৈরি করতে হয়। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করার দায়িত্ব দেয়া হলো মেজো ভাইকে, যেহেতু তার বন্ধুরা অনেকেই উকিল।

ইতিমধ্যে লিলিরা বনানীতে বেশ বড় একটা বাড়িতে উঠে এসেছে, মাসে ভাড়া দেয় ছ'হাজার টাকা। বাড়িতে ফোন, এ/সি, ফ্রিজ, কালার টিভি, যা যা প্রয়োজন সবই আছে। অফিসের কাজে দুটো গাড়ি লাগে, সেই গাড়ি করেই স্কুলে আসা-যাওয়া করে লিলি। তার সব বায়নাই এখন পূরণ হয়, অভাব শুধু বাবার সেই মধুর সঙ্গটুকু—সকালবেলা বেরিয়ে যান তিনি, ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন গভীর রাতে।

কথা চলছে, ভাড়া করা বাড়িতে আর নয়, বনানীতেই জায়গা কিনে বাড়ি তৈরি করা হবে। সেই সঙ্গে, শুধু লিলির জন্যে, কেনা হবে একটা লাল গাড়ি। আর মাত্র ক'টা দিন, মালিকানার দলিল তৈরি হবার পরই ব্যাংকের জমা টাকা ভাগ করে নেবে চার ভাই। আপাতত সবাই তারা শুধু মাসিক খরচার টাকা তোলে।

তারপর অকস্মাৎ স্বর্গচ্যুত হলো পরিবারটি। বিকেলবেলা অফিসে কাজ করছেন লিলির বাবা, বুকে ব্যথা অনুভব করলেন। হলিক্রসে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে। ডাক্তাররা বললেন, 'আপনারা তো লাশ নিয়ে এসেছেন।'

লিলির তখন মাত্র আট বছর বয়েস। বাড়িতে লাশ আনার পর

সবাইকে বিব্রত ও হতভম্ব করে দিয়ে সে জানাল, বাবার সঙ্গে সে-ও কবরে থাকবে, সে তার বাবাকে মাটির নিচে একা কোনভাবেই থাকতে দেবে না। তার এই কথা শুনে চাচারা সবাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তখনকার তাদের কান্না দেখে কারও পক্ষে ধারণা করা সম্ভব ছিল না যে এই চাচারাই তাদের একমাত্র ভাইঝিকে বঞ্চিত করার জন্যে সম্ভাব্য সব রকম কৌশল কাজে লাগাবে এবং তাতে সফলও হবে। মানব চরিত্র বড়ই বিচিত্র, নিজের সঙ্গেই তার শত্রুতা, নিজেকে অপমান করাটাকে সে লাভজনক মনে করে। বড় ভাই মারা যাবার পর চল্লিশ দিনও পেরুল না, ব্যবসার হিসাব এমনই কারচুপি করা হলো যে দেখা গেল এতদিন ব্যবসা করে প্রায় কোন লাভই হয়নি, যা আয় হয়েছে খরচও প্রায় তার কাছাকাছি। শুধু তাই নয়, তিন ভাই যার যার শাখার একক মালিকানা দাবি করে বসল, এবং পরস্পরের দাবি তারা খুশি মনেই মেনে নিল। ভাগ হলো শুধু বড় ভাই ব্যবসার যে দিকটা দেখতেন তার লাভের অংশ।

দু'মাস পর বড় ভাবীকে পাঁচ লাখ টাকার একটা চেক দিয়ে গেল তিন দেওর। সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানাতে কার্পণ্য করল না কেউ, তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও জানাতে ভুলল না যে তাদের আগের সেই ব্যবসার আর কোন অস্তিত্ব নেই, ফলে লিলি বা লিলির মায়ের কোথাও কোন অংশিদারিত্বও নেই।

ছিয়াত্তর-সাতাত্তর সালে পাঁচ লাখ অনেক টাকা, কিন্তু ন্যায্য প্রাপ্য অংশের চেয়ে বহুগুণ কম। তাদেরকে যে বঞ্চিত করা হয়েছে, এটা বুঝতে পারলেও লিলির মার করার কিছু ছিল না। তার একমাত্র ভাই সপরিবারে কানাডার নাগরিকত্ব পেয়ে গেছেন, আপনজন বলতে আর তেমন কেউ নেই যাকে বিশ্বাস করা যায়। টাকাটা ব্যাংকে রেখে দিলেন তিনি, পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখলেন ভাইকে। তার ভাই ও ভাবী দু'জনেই ডাক্তার।

একমাত্র বোনের বিপদে বিচলিত হলেন লিলির মামা। সেগুনবাগিচায়

তার একটা বাড়ি আছে, একজন ভাড়াটেকে রেখে অপরজনকে উঠিয়ে দিয়ে সেই বাড়িতে থাকতে বললেন বোনকে। পরামর্শ দিলেন, টাকাটা যেন ব্যাংকেই ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখা হয়। চিঠিতে তিনি আরও পরামর্শ দিলেন, যতদিন না ফিক্সড ডিপোজিটের ইন্টারেস্ট তোলা যায় ততদিন ভাড়াটের কাছ থেকে পাওয়া টাকা দিয়ে সংসার চালাতে হবে তাকে।

ভাইয়ের পরামর্শ মতই কাজ করলেন লিলির মা। শুরু হলো মা ও মেয়ের নিঃসঙ্গ জীবন।

বাবার স্বপ্নটা কি ছিল, বড় হবার পর ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছে লিলি। কাকারা সবাই ঢাকা শহরে গাড়ি ও বাড়ির মালিক হয়েছে, ভাবী আর ভাইঝির খোঁজখবর নেয়ার জন্যে মাঝেমধ্যে আসেও তারা। উৎসব অনুষ্ঠানে মেয়েকে নিয়ে লিলির মাও তাদের বাড়িতে বেড়াতে যান, আত্মীয়তার ক্ষীণ সম্পর্কটা রক্ষা করার জন্যে। একা মানুষ তিনি, বোঝেন যে নিরাপত্তার স্বার্থেই কারও সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করা উচিত নয় তাঁর। কিন্তু আসা-যাওয়া থাকলেও, ভুলেও কখনও দেওরদের গাড়িতে চড়েন না। চড়েন না লিলির জেদে। কাকাদের গাড়ি দেখলেই তার মনে পড়ে যায়, মারা যাবার মাত্র দু'দিন আগেও মাকে গাড়ি কেনার কথা বলেছিলেন বাবা। লিলির জেদ, বাবার মত সে-ও ব্যবসা শিখবে, ব্যবসা করে গাড়ি ও বাড়ি কিনবে—কিনবে মার নামে। মেয়ে হয়েছে তো কি হয়েছে, আজকাল মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। ব্যবসা করে সুখী সুন্দর জীবনযাপন করার বাবার অপূর্ণ স্বপ্নটা পূরণ করার জেদ এমনভাবেই পেয়ে বসল তাকে, নিজের চারপাশে একটা বর্ম তৈরি করল লিলি, যাতে তার মনোযোগে চিড় না ধরে, কোন প্রলোভন যাতে তাকে টলাতে না পারে। বড় হবার পর থেকেই পিছনে লাগল ছেলেরা, প্রথম প্রথম ইচ্ছে করেই তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত ও তারপর বুদ্ধি হলো, ছেলেদেরকে এড়িয়ে থাকার নতুন

নতুন কৌশল শিখল। নিজকে বোঝাল, কার সঙ্গে প্রেম করবে সে, ভাল কোন ছেলে থাকলে তো। কলেজে ওঠার পর কয়েকটা ছেলেকে ভাল বলে মনে হলেও, তারা সত্যি ভাল কিনা পরখ করে দেখার গরজ অনুভব করল না, ধরে নিল ওরাও মুখোশ পরে আছে। মনে মনে ভাবত, দাঁড়াও, আগে নিজের পায়ে দাঁড়াই, গাড়ি-বাড়ি বানাই, তারপর খোঁজ নিয়ে দেখব কে তোমাদের মধ্যে আমার উপযুক্ত। ততদিন তোমাদেরকে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, সরি।

বলা যায় এ-ও লিলির একটা প্রতিজ্ঞা, ব্যবসা শিখে গাড়ি-বাড়ি না করে কোন ছেলের কথা ভাববে না—যতই সে ভাল বা সুদর্শন হোক না কেন, কিংবা ওর প্রেমে যতই হাবুডুবু খাক না কেন। কিন্তু যদি নিয়তির লিখন দেখতে পেত, যদি জানত প্রতিজ্ঞায় অটল থাকতে পারবে না···।

চাকরিটা হঠাৎ ভাগ্যগুণে হয়ে গেল। অনার্স পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে বসে আছে, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দেখি তো কি হয় ভেবেই আবেদন করল। বিজ্ঞাপন দিয়েছে একটা ইনডেন্টিং ফার্ম, ও যে লাইনে কাজ শিখতে চায়। আবেদন করার পর ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল, ইন্টারভিউ লেটার পেয়ে দারুণ অবাক হলো। অবাক হলো, ঘাবড়েও গেল। কাজ শিখে ব্যবসা করার ইচ্ছে আছে ঠিকই, কিন্তু লোক মুখে শুনে শুনে বাস্তব দুনিয়াটাকে সাংঘাতিক ভয় পায় লিলি। এই সমাজে চারদিকে ফাঁদ পাতা আছে, পা ফেলতে যা দেরি, ফেঁসে যেতে হবে। প্রায় সবারই ধারণা, মেয়েরা বাইরে কাজ শুরু করলে তাদের আর চরিত্র ঠিক থাকে না। কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না লিলি। কেউ যদি নষ্ট হতে না চায়, আর সাবধান থাকে, কে তাকে নষ্ট করবে? তবু ভয়টা মন থেকে দূর হয় না—সমাজটার তো কোন মাথামুণ্ড নেই, মেয়েদেরকে এখানে রাখাই হয়েছে অরক্ষিত অবস্থায়।

একদিকে কর্মজীবনে পা ফেলার রোমাঞ্চ, অন্য দিকে অজানা

বিপদসঙ্কুল জগতে ঢোকার ভয়, ইন্টারভিউ দিতে এসে উত্তেজনায় ঘেমে নেয়ে উঠল লিলি, যদিও ফার্মটা ভুয়া কিনা বা ফার্মের মালিক মন্দ লোক কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে ওর মা আগেই যতটুকু পারা যায় তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

ফার্মের মালিক নিজেই ওর ইন্টারভিউ নিল। সুসজ্জিত অফিস, কামরার ভেতর এয়ারকুলার চলছে, কমপ্লিট স্যুট পরে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে রায়হান চৌধুরী। তাকে দেখে একটু অবাকই হলো লিলি। খুব বেশি হলে বয়েস হবে বত্রিশ, এরইমধ্যে বেশ বড়সড় ব্যবসা জমিয়ে ফেলেছে। চেহারা দেখে বুদ্ধিমান, ভদ্র আর স্মার্ট বলে মনে হলো, যদিও ওর মনে হওয়াটা সত্যি কিনা জানা যাবে চাকরি হবার পর।

প্রথম প্রশ্ন, ইনডেন্টিং-এ তার অভিজ্ঞতা আছে কিনা। নেই, জবাব দিল লিলি। তবে জানাল, ও একজন ইনডেনটরের মেয়ে। ওর বাবার বিলুপ্ত ফার্মের নামও বলল। প্রশ্নের উত্তরে নাম বলল তিন কাকার, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে যাদের খ্যাতি আছে। তারপর জানতে চাওয়া হলো, আরও পড়াশোনা করার ইচ্ছে আছে কিনা, চাকরি করতে চাওয়ার কারণ কি, কত টাকা বেতন আশা করে সে, এই সব। সবশেষে যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্যে লিখিত কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো।

ইন্টারভিউ শুরু হবার পর ভয়-ভীতি কোথায় সব পালাল বলতে পারবে না লিলি। রায়হান চৌধুরীকে ওর কতদিনের পরিচিত আপনজন বলে মনে হতে লাগল। কে কোন চরিত্রের মানুষ তা তো চোখ দেখে অনেকটা বোঝা যায়ই, আসল পরীক্ষা হয়ে যায় কোন লোক যখন একটা মেয়ের সঙ্গে একা বসে কথা বলে। অনেক অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নও করা হলো ওকে, তবে উঁকি দিয়ে ওর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো দেখতে চাওয়া হলো না বা অমার্জিত কোন কৌতুকও করা হলো না। ইন্টারভিউ দিয়ে বাড়ি ফিরে মাকে লিলি বলল, 'ভদ্রলোককে খুব ভাল লাগল।' শুধু ভাল

লাগেনি, সবচেয়ে বড় কথা ওর মনে হয়েছে রায়হান চৌধুরীর কাছে চাকরি করাটা মেয়ে হিসেবে ওর জন্যে নিরাপদ, তার দ্বারা ওর কোন অমর্যাদা হবে না।

'ইন্টারভিউ কেমন হলো, চাকরিটা তোর হবে?' জানতে চাইলেন ওর মা।

হবে, মনে মনে বলল লিলি। আসলে ওর মনে কোন সন্দেহই নেই। কারণ ওর ধারণা, ওকেও খুব পছন্দ হয়েছে রায়হান চৌধুরীর। মাকে উত্তর দিল, 'কি জানি, আরও অনেক মেয়েই তো ইন্টারভিউ দিয়েছে। দেখা যাক।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও অনেক প্রশ্ন করলেন মা—ভদ্রলোকের বয়েস কত, বিবাহিত কিনা ইত্যাদি। লিলির কাছে এ-সব প্রশ্নের কোন গুরুত্ব নেই। জীবনে প্রথম চাকরি যার কাছে হতে যাচ্ছে তিনি মানুষ হিসেবে ভদ্র, পরস্পরকে তারা অপছন্দও করছে না অর্থাৎ কাজ শেখার একটা ভাল পরিবেশ পাওয়া যাবে—ব্যস, এতেই খুশি।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে একটুও অবাক হয়নি লিলি। জয়েন করার দিন ওর বসকে রজনীগন্ধার স্টিক উপহার দিল ও। দুপুরের লাঞ্চ বাড়ি থেকে তৈরি করে দেন ওর মা, পরিমাণে একটু বেশিই দেন, অফিসে বসে আর যারা লাঞ্চ করে তাদেরকে তা থেকে ভাগ দেয় লিলি। কর্মচারীদের সঙ্গে সুন্দর একটা সম্পর্ক তৈরি করে নিল ও। মাত্র কয়েক দিন অফিস করার পর দুটো অস্বস্তিকর তথ্য জানতে পারল ও। একটা হলো, পুরানো দু'জন কর্মচারী ফার্মের সঙ্গে দীর্ঘদিন বেঈমানী করছিল, পার্টিদের কাছ থেকে গোপন কমিশন খাচ্ছিল, ধরা পড়ার পর তাদের চাকরি গেছে। চাকরি যাওয়াতে তাদের কোন ক্ষতি হয়নি, ইতিমধ্যে নিজেরাই ব্যবসা শুরু করার মত যথেষ্ট টাকা কামিয়ে নিয়েছে, করেছেও তাই। কিন্তু ফার্মের ক্ষতি হয়েছে যথেষ্ট। বড় কয়েকটা পার্টি ছুটে গেছে,

অনেক বিদেশী ম্যানুফ্যাকচারার ও সাপ্লায়ারের আস্থাও হারিয়েছে। তাদের দু'জনের চাকরি যাওয়াতেই নতুন লোকের প্রয়োজন হয়। রায়হান চৌধুরী সিদ্ধান্ত নেয়, দু'জনের বদলে একটা মেয়েকে চাকরি দেবে। তার বিশ্বাস, পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা অনেক বেশি বিশ্বস্ত।

আরেকটা তথ্য হলো, ওর বস্ রায়হান চৌধুরীর জীবনে শান্তি নেই। কারণটা কি, কেউ যদি জানেও, লিলিকে বলতে রাজি হলো না। কর্মচারীরা সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে তাদের বসকে, তার ব্যক্তিগত বিষয়ে আলাপ করতে একদমই রাজি নয়। রায়হান চৌধুরীর জীবন যে অশান্তিময়, তা কাউকে বলে দিতে হয়নি, লিলি নিজেই তা ধরতে পারে। তাকে সব সময় বিষণ্ন থাকতে দেখেই কলিগদের প্রশ্ন করেছিল ও। সবাই এড়িয়ে গেছে, চেপে ধরায় একজন শুধু বলেছে, 'হ্যাঁ, বাড়িতে অশান্তি আছে—কারণটা আমরা কেউ জানি না।'

লিলির মনে হয়েছে, কারণটাও সবাই ওরা জানে, কিন্তু আলোচনা করতে চায় না। মার্জিত একজন ভদ্রলোক অশান্তিতে ভুগছেন, এটা জানার পর স্বভাবতই সহানুভূতি জাগে লিলির মনে, ইচ্ছে হয় অশান্তির কারণটা জানে, বসের জন্যে কিছু একটা করার সুযোগ থাকলে করে। শুধু সেজন্যেই রায়হান চৌধুরীর সঙ্গে আরেকটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে ও। হাতে কাজ না থাকলে ব্যবসায়িক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার অজুহাতে ঢুকে পড়ে বসের কামরায়, প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত সময় বসে থাকে, কাজের কথা ছেড়ে গল্প করার সুযোগ খোঁজে। রায়হান চৌধুরীকে যতই দেখে ততই বিস্মিত হয় ও। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারে, মেয়েরা বসের কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তার দৃষ্টিতে কোন রকম নোংরামির ছিটেফোঁটাও নেই। এরকম একজন মানুষ দাম্পত্য জীবনে সুখী নয়, বিশ্বাস করা যায় না।

ঘনিষ্ঠতা আগের চেয়ে অনেক বাড়ল, কিন্তু তাতে কোন লাভ হলো

না, কারণ ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা তুললেই রায়হান চৌধুরী হঠাৎ যেন বোবা বনে যায়। মরিয়া হয়ে লিলি একদিন বলেই ফেলল, 'ভাবীকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে, বাড়িতে একদিন নিয়ে যাবেন?'

'ঠিক আছে,' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জবাব দিয়েছে রায়হান চৌধুরী। 'কবে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, সুযোগ-সুবিধে মত জানাব তোমাকে।'

এরপর আর যাবার কথা তোলা সাজে না লিলির। তোলেওনি। তবে চোখ-কান খোলা রাখায় অদ্ভুত কয়েকটা ব্যাপার লক্ষ করে ও। দুপুরে কোনদিন বাড়িতে খেতে যায় না রায়হান চৌধুরী, বাড়ি থেকেও তার জন্যে খাবার পাঠানো হয় না। রাত সাড়ে সাতটার পর আর কর্মচারীরা কেউ অফিসে থাকে না, কিন্তু তাদের বস্ রাত এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত একা বসে থাকে অফিসে। শুধু শুধু বসে থাকে, কাজ থাকলে তারা সবাই জানতে পারত। এমনকি ছুটির দিনও অফিসে চলে আসে। বেশিরভাগ সময় চেয়ারে বসে, চোখ বন্ধ করে দোল খায়, আর কি যেন চিন্তা করে।

আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করল লিলি। অপব্যয় ছাড়া কি বলা যায়, প্রতি মাসে ডজন ডজন শার্ট-প্যান্ট আর শাড়ি-ব্লাউজ কিনবে। অথচ কর্মচারীদের মুখে শুনেছে, বছরে দু'বার বিদেশে যায় রায়হান চৌধুরী, সারা বছরের কাপড়চোপড় সবই সেখান থেকে নিয়ে আসে। শুধু যে কাপড়চোপড় তা নয়, ডিনার সেট থেকে শুরু করে কসমেটিকস, সোফা থেকে শুরু করে অন্যান্য ফার্নিচার দু'এক মাস পরপর কিনছেই। একই মাসে একই জিনিস দু'বারও তাকে কিনতে দেখেছে লিলি। প্রশ্নও করেছে, কিন্তু রহস্যের কোন সমাধান পায়নি। জিজ্ঞেস করলে রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়ে রায়হান চৌধুরী, দায়সারা গোছের একটা জবাব দিয়ে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায়। তার প্রতি সহানুভূতি আরও বাড়ে লিলির, তবে বিব্রত করতে মন চায় না বলে আর কোন প্রশ্ন করে না।

ও বুঝতে পারে, তার দাম্পত্য জীবনটা বড় ধরনের একটা সংকটের

মধ্যে কাটছে। এ-ব্যাপারে কিছু একটা করতে মন চাইলেও সুযোগ নেই লিলির, রায়হান চৌধুরীর ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাবার অনুমতি পায় না ও। সে যাতে আরও সহজ হতে পারে, ব্যক্তিগত বিষয়েও আলাপ করে ওর সঙ্গে, সেজন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে লিলি। চাকরি হয়েছে ছ'মাস, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার বাড়িতে ডেকে বসকে খাইয়েছে ও। প্রতিবারই সস্ত্রীক আসতে বলেছিল, কিন্তু একাই এসেছে রায়হান চৌধুরী। জিজ্ঞেস করলে স্ত্রী অসুস্থ বা বাপের বাড়ি গেছে বলে অজুহাত দেখিয়েছে।

চাকরি করতে এসে নানাদিকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হচ্ছে লিলির। ওদের একজন কর্মচারী, বয়েস প্রায় পঞ্চাশ, চার হাজার টাকার বেতনে এই ঢাকা শহরের দশ জনের একটা বিশাল সংসার চালান। তাঁর চার ছেলেমেয়ে, দু'জন পড়ে কলেজে, দু'জন স্কুলে। স্ত্রী রুগ্ন, তারপরও পাড়ার বাচ্চাদের আরবী পড়িয়ে পাঁচ-সাতশো টাকা রোজগার করেন। ভদ্রলোকের বাবা বাতে শয্যাশায়ী, চৌকি থেকে নামার শক্তিও নেই, আর মা আধ পাগলা। এক বোন স্বামীর মারধর সহ্য করতে না পেরে ভাইয়ের কাছে ফিরে এসেছে, সঙ্গে একটি বাচ্চা। ঢাকা শহরে বাড়ি ভাড়া করে কিভাবে এই টাকায় সংসার চালান তিনি, লিলির মাথায় ঢোকে না। ওদের সব কর্মচারীর অবস্থাই প্রায় একই, সবাই ধুঁকে ধুঁকে মরছে, তফাৎ শুধু মাত্রার। তা-ও তো বেসরকারী চাকরি বলে বেতন ভালই পায়, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে থাকলেও সরকারী চাকুরেদের বেতন আরও কম। লিলি বুঝতে পারে না দেশের বেশিরভাগ মানুষের অবস্থা যেখানে এর চেয়েও অনেক খারাপ সেখানে নতুন প্রজন্মের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ কিভাবে সম্ভব। কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, মন্ত্রী আর রাজনীতিকদের ওপর খুব রাগ হত ওর। এদের গান গল্প প্রতিবেদন-প্রকল্প আর ইস্যুর একটি মাত্র উদ্দেশ্য থাকা উচিত ছিল—আর্থিক সচ্ছলতার পথে বাধাগুলো আবিষ্কার এবং তা পেরুবার জন্যে সাধারণ মানুষকে আত্মনির্মাণে উদ্বুদ্ধ

করা। তার বদলে কবিরা হয় প্রকৃতির প্রশস্তি গাইছেন নয়ত হতাশা ছড়াচ্ছেন। সাহিত্যিকরা তাদের গল্পে-উপন্যাসে অবাস্তব পরিবেশ আর চরিত্র সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত নন, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে চেষ্টা করছেন দরিদ্র হওয়াটা গর্বের বিষয়, এর মধ্যে মহৎ হবার উপাদান আছে। সাংবাদিকরা ভুলে গেছেন তাঁদের পরিচয় শুধুমাত্র প্রতিধ্বনি নয়, ভুলে গেছেন ধ্বনিগুলোর উৎস সুবিধেভোগীরা; গোটা দেশের রোমহর্ষক নীরব কান্না তাঁদেরকে প্রায় স্পর্শই করে না।

তারপর লিলি ভাবে, একা কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, আমরা কেউই নিজেদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছি না বলেই দেশটার আজ এই করুণ অবস্থা দাঁড়িয়েছে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কেন আমরা কেউ নিজেদের দায়িত্ব পালন করছি না? এর সম্ভাব্য মাত্র দুটো উত্তর আছে। এক, দেশটাই সম্পদহীন, কাজেই গরীব হওয়া ছাড়া উপায় নেই আমাদের। দুই, মানুষ হিসেবে এই অর্থে অসভ্য আমরা যে প্রাচুর্যময় সুন্দর জীবনের অধিকারী হবার জন্যে যে যোগ্যতা থাকা দরকার তা আমাদের নেই। প্রথমটা বিবেচনার যোগ্য নয়, কারণ আধুনিক যুগে এটা প্রমাণিত সত্য যে মানুষ নিজেই একটা সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকলেও একটা জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা অসভ্য তাই কেউ তার দায়িত্ব পালন করছি না, এটাই বোধহয় সঠিক উত্তর। সভ্য হবার জন্যে যে ঐতিহ্য থাকা দরকার তা কি আমাদের আছে? আমরা কি প্রাচুর্যময় সুন্দর জীবন কাকে বলে জানি? আমরা কি এতটা সভ্য যে কায়িক পরিশ্রমকে ছোট করে দেখি না, কেউ উন্নতি করতে চেষ্টা করছে দেখলে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাই? আমাদের সমাজ কি কুসংস্কারকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে, শিখেছে ধর্মীয় গোঁড়ামি ত্যাগ করে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতে? আমরা কি নারীকে মুক্তি দিতে পেরেছি? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর এক—না।

হাসি আর আনন্দ থেকে রায়হান চৌধুরী, ওর বস্, একেবারেই বঞ্চিত, উপলব্ধি করতে পেরে মনটা খারাপ হয়ে যায় লিলির। সময় পেলেই তার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে লেগে যায় ও, বুঝতে চেষ্টা করে গলদটা কোথায়। ইতিমধ্যে শুধু মানুষ হিসেবে নয়, ব্যবসায়ী হিসেবেও রায়হান চৌধুরীকে অনেকটা চিনে ফেলেছে লিলি। তার অনেক দুর্লভ গুণ থাকলেও, কিছু কিছু ব্যাপার একদম সমর্থনযোগ্য নয়। 'প্রেস্টিজ' শব্দটা প্রায়ই ব্যবহার করে সে, ওটা না হারাতে হয় এই ভেবে সারাক্ষণ তটস্থ থাকে। তার এই প্রেস্টিজ জ্ঞান ভুয়া একটা ব্যাপারই বলতে হবে, বিশেষ করে ব্যবসার নামে যে সব কূটকৌশল ব্যবহার করছে সেগুলোর কথা মনে রাখলে। ইমপোর্টারকে এক নম্বর পণ্যের কথা বলে বিদেশ থেকে আনিয়ে দিচ্ছে দু'নম্বর পণ্য, ধরা পড়লে দোষ চাপাচ্ছে বিদেশী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর। পার্টির রেমিট্যান্সের টাকা বিদেশে না পাঠিয়ে নিজের কাজে ব্যয় করে ফেলছে, সময়মত শিপমেন্ট না হওয়ায় ক্ষতি হচ্ছে ইমপোর্টারের। পার্টি যদি বিদেশী সাপ্লায়ারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে, নিজের কৃতিত্বের দাবি তুলে ভাগ বসাচ্ছে তাতে। এ-সবই অন্যায় ও অবৈধভাবে টাকা রোজগারের কৌশল, সুযোগ পেলেই ব্যবহার করছে, আবার একই সঙ্গে বজায় রাখতে চাইছে প্রেস্টিজ—উপায় না দেখলে সমস্ত দোষ কর্মচারীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে। একটা ব্যাপার বুঝতে অনেক দেরি করে ফেলে লিলি—কর্মচারীরা কেউ তাকে শ্রদ্ধা করে না, চুপ করে থাকে ভয়ে। তাদের মধ্যে নাকি বসের একজন চর আছে, কে কি বলছে বা করছে সব জানিয়ে দেয়া হয়। এই দুর্মূল্যের বাজারে চাকরি হারাবার ঝুঁকি কেউ নিতে চায় না।

অসৎও হব, আবার আত্মমর্যাদাও বজায় রাখব, এ কোনদিন সম্ভব নয়। লিলি ধারণা করে, রায়হান চৌধুরীর চরিত্রে এই বৈপরীত্যই এমন একটা ঘটনার জন্ম দিয়েছে যার ফলে তার জীবনটা হয়ে উঠেছে নরক

বিশেষ।

তারপর অফিসে একদিন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল। তখন পাঁচটার মত বাজে, অন্যান্যদিন সাতটা পর্যন্ত অফিস করলেও সেদিন মাকে নিয়ে এক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যাবে বলে ছুটি চেয়ে রেখেছে লিলি। মুখে পাফ বুলিয়ে, চুল ঠিকঠাক করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এঁল ও। দরজার দিকে এগোবে, খুলে গেল সেটা। ভেতরে ঢুকল অপরূপ সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গি এক যুবতী। এতই তার রূপ, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল লিলি। দরজা খুলে সরাসরি ওর দিকেই এগিয়ে আসছে মেয়েটা। পরনে অত্যন্ত দামী শাড়ি, গা ভরা গহনা। ফর্সা মুখটা টকটকে লাল হয়ে আছে।

ঠিক লিলির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'কুত্তার বাচ্চাটা আছে?' জানতে চাইল হিসহিস করে।

হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেলো লিলি, কেউ যেন চড় মেরেছে ওকে। ইতিমধ্যে যে যার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে স্টাফরা। 'আপনি…,' শুধু এইটুকু বলতে পারল লিলি, বোকার মত তাকাল স্টাফদের দিকে।

তারপর সত্যি একটা ধাক্কা খেলো লিলি, ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল মেয়েটা, পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল রায়হান চৌধুরীর কামরায়।

'কে উনি?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল লিলি, পালা করে স্টাফদের দিকে তাকাচ্ছে।

কেউ কিছু বলার আগে রায়হান চৌধুরীর কামরা থেকে মেয়েটার তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল, 'শুয়োরের বাচ্চা, আমি তোর প্রেস্টিজের নিকুচি করি। আমি শুধু জানতে চাই, টাকাটা দিবি কিনা বল।'

'নার্গিস, প্লীজ…,' রায়হান চৌধুরীর চাপা গলা শুনতে পেল ওরা।

'দিবি কিনা বল, তা না হলে আজই তোকে আমি ডিভোর্স করব। আমি কোন ফ্যামিলির মেয়ে, বিয়ে করার সময় মনে ছিল না তোর? আজ এক হপ্তা ধরে বলছি টাকাটা লাগবে আমার, কথা কানে যায় না? বাস্টার্ড,

ভেবেছিস এড়িয়ে যেতে পারবি? দেখ আজ আমি তোর কি করি···।'

'নার্গিস, প্লীজ! শান্ত হও। টাকা আমি দেব না তা তো বলিনি। বলেছি আরও ক'টা দিন সময় দাও আমাকে···আর এখনই যদি চাও, লাখ দুয়েক···।'

'পাঁচ লাখ, এক পয়সা কম নয়। কোত্থেকে পাবি আমি জানি না। তখনই তো বারণ করেছিলাম, আমার আশা ছেড়ে দে, আমাকে পুষতে হলে টাকার পাহাড় থাকতে হবে তোর। কাল সকালের মধ্যে টাকা চাই আমার, তা না হলে···।'

চাপা স্বরে রায়হান চৌধুরী কি বলল বাইরে থেকে ওরা কেউ তা শুনতে পেল না। তারপরই শুরু হলো ভাঙচুর। ভঙ্গুর জিনিস রায়হান চৌধুরীর কামরায় অনেক কিছুই আছে—শো-কেস, দামী পেইন্টিং, গ্লাস টপ টেবিল, কাচের পার্টিশন। আওয়াজ শুনে মনে হলো একটাও রক্ষা পাচ্ছে না। অকস্মাৎ দড়াম করে খুলে গেল দরজা, কামরা থেকে বেরিয়ে এল যেন এক উন্মাদিনী। আরেকবার ধাক্কা খেলো লিলি, ওকে সরিয়ে দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল রায়হান চৌধুরীর স্ত্রী।

স্টাফরা পাথরের মূর্তির মত বসে আছে, কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। মিনিট পাঁচেক পর দারোয়ান ও পিয়নকে ডেকে বলে দেয়া হলো, বস্ আজ কোন ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা করবেন না, কাজ থাকলে কাল সকালে আসতে হবে।

কখন যে একটা চেয়ারে বসে পড়েছে লিলি, বলতে পারবে না। বিশ-পঁচিশ মিনিট পর ওর নাম ধরে ডাকল রায়হান চৌধুরী। কাউকে ডাকতে হলে সাধারণত বেল বাজিয়ে পিয়নকে ডাকে সে। ঘটনাটা ঘটতে শুরু করার পর ঘেমে গিয়েছিল লিলি, সেই ঘাম এখনও শুকোয়নি। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে ধীর, আড়ষ্ট পায়ে ভেতরে ঢুকল ও।

রায়হান চৌধুরী সাধারণত সিগারেট খায় না, তবে ক্লায়েন্টদের অফার

করার জন্যে তার টেবিলে সব সময় বেনসনের প্যাকেট থাকে। ভেতরে ঢুকে লিলি দেখল, একটা সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে সে, তবে হাত দুটো এত বেশি কাঁপছে যে ঠিকমত ধরাতে পারছে না।

সিগারেট ধরিয়ে খুক করে একবার কাশল রায়হান চৌধুরী। 'ওদেরকে বলো ওরা সবাই চলে যেতে পারে, শুধু পিয়ন থাকুক। তারপর তুমি একবার এসো।'

'ঠিক আছে,' বলে বেরিয়ে এল লিলি। পাঁচ মিনিট পর, স্টাফরা সবাই চলে যেতে, আবার ঢুকল বসের কামরায়।

ওকে দেখে মুখ তুলল রায়হান চৌধুরী, জোর করে হাসার চেষ্টা করল। 'নার্গিস, তোমার ভাবী, আসলে একটু পাগলাটে। এখনও ছেলেমানুষ তো। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

'না, আমি কেন কিছু···।'

লিলিকে থামিয়ে দিয়ে একনাগাড়ে কথা বলতে শুরু করল সে, 'ব্যাপারটা কি জানো, খুবই অভিজাত পরিবারের মেয়ে ও। ওর দুই ভাই ব্যারিস্টার, লণ্ডনে আর সিডনিতে প্র্যাকটিস করে। এক ভাই ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। বাবা থাকেন আমেরিকায়, ফ্যাশন হাউসের মালিক। ওর মা ফ্যাশন ডিজাইনার। ম্যানহাটনে ওদের বাড়ি আছে। ওর এক বোনের বিয়ে হয়েছে আমেরিকান এক পপ গায়কের সঙ্গে। কাকা আর মামারাও সবাই এক একজন বিরাট ধনী মানুষ, ওর এক খালা তো জাতিসংঘে আছে···।'

চুপ করে শুনে যাচ্ছে লিলি, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। একজন পুরুষ মানুষ এ-ধরনের চরম অপমানিত হবার পর স্ত্রীর প্রশংসা করে কিভাবে মাথায় ঢোকে না।

'বংশ বিচারে আমরাও ওদের চেয়ে কম যাই না,' বলে চলেছে রায়হান চৌধুরী। 'চৌধুরী হিসেবে দেশের বাড়িতে আমাদেরও খ্যাতি কম নয়।

তবে, সত্যি কথা বলতে কি, আমি ঠিক নার্গিসের উপযুক্ত নই—মানে, অন্তত টাকার বিচারে। এমনিতে তোমার ভাবী কিন্তু সাংঘাতিক ভাল মানুষ, বলতে পারো একেবারে মাটির মানুষ। কিন্তু মাথায় রক্ত চড়ে গেলে আর কোন হুঁশ-জ্ঞান থাকে না। একে বড়লোকের মেয়ে, তার ওপর আদরে মানুষ হয়েছে। জেদ যখন ধরেছে, টাকাটা যেভাবে হোক যোগাড় করে দিতে হবে—দেখি, ধারই মাহয় করব।'

'এত টাকা উনি···?'

'আরে, বোলো না! শখ চেপেছে, মা-বাবার কাছে বেড়াতে যাবে। মুখ ফুটে একবার বললেই আমার শ্বশুর পাঁচ-দশ লাখ পাঠিয়ে দেন, কিন্তু না, বাপের কাছে স্বামীকে ছোট করতে রাজি নয়। ফেরার সময় শপিং করবে। বছর দুয়েক আগে একবার গেছে, সেবারও পাঁচ লাখ দিয়েছিলাম, কিন্তু তখন আমার ইনকাম ছিল···দেখি, বড় একটা দাও যদি মারতে পারি তাহলে কোন সমস্যা হবে না।'

লোকটার জন্যে করুণা হলো লিলির। জিজ্ঞেস করল, 'আমি তাহলে যাই এখন? মাকে বলে এসেছি···।'

'হ্যাঁ, আমার মনে আছে। ঠিক আছে, তোমাকে আর আটকে রাখব না। তবে একটা কথা, লিলি—তুমি তো আমাদের নিজের মানুষ, তাই না? একসঙ্গে কাজ করতে হলে তোমার অনেক কথা আমি জানব, তুমি আমার অনেক কথা জেনে ফেলবে। আমাদের সবারই প্রেস্টিজ আছে, ভেতরের কথা বাইরে না ছড়ানোই ভাল। মানে, বলছিলাম কি, তুমি যেন আবার এসব কথা কাউকে···।'

লিলি বুঝতে পারছে, বস্ তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। লোকটার ওপর ওর রাগ হবার কথা, যদিও ঘটল উল্টোটা। ও ভাবল, রায়হান ভাই আমাকে বসতে বললে ভাল হত। ইচ্ছে হলো, তাকে খানিকক্ষণ সঙ্গ দেয়, দুটো সান্ত্বনার কথা বলে, জানায় তার দুঃখে সে-ও দুঃখী। সব মিলিয়ে

লোকটা যেমনই হোক, তার প্রতি একটা দরদ অনুভব করে লিলি। 'রায়হান ভাই,' আপনি নিশ্চিত থাকুন—কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমি এমনকি আমার মার সঙ্গেও আলাপ করি না।'

'ধন্যবাদ, লিলি। ঠিক আছে।'

ঠিক আছে—তারমানে তুমি এখন যাও। কিন্তু লিলি নড়ল না। 'আপনার কিছু লাগবে, রায়হান ভাই? পিয়নকে কিছু বলব?'

'না···না, কিছু লাগবে না।' অ্যাশট্রেতে জ্বলন্ত সিগারেট রয়েছে, সেটার কথা ভুলে নতুন আরেকটা ধরাল রায়হান চৌধুরী। 'তোমার বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে, লিলি। খালাম্মা তোমার জন্যে চিন্তা করছেন।'

হাতঘড়ির ওপর চোখ রাখল লিলি। 'পার্টিদের তো এখনই আসার সময়। আমি নাহয় থেকেই যাই, তা না হলে ওরা আপনাকে বিরক্ত করবে। বাড়িতে টেলিফোন করে বলে দিই আজ আর···।'

ম্লান হেসে রায়হান চৌধুরী বলল, 'বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে··· কিন্তু তার কোন দরকার নেই, লিলি। পার্টিদের পিয়নই সামলাতে পারবে। আমি একটু একা থাকতে চাই।'

এরপর আর থাকা যায় না। ঠিক অপমান বোধ করেনি, তবে খানিকটা অভিমান হলো লিলির। ওর সহানুভূতি জানাবার ইচ্ছেটাকে মর্যাদা দেয়া হয়নি ভেবে।

পিয়নকে কোথাও পাওয়া গেল না, অগত্যা বসকে অফিসে একা রেখেই বেরিয়ে পড়ল লিলি। সিঁড়ি বেয়ে নামছে, বাঁক ঘুরতেই শাহিনকে দেখতে পেল, কয়েক ধাপ নিচে দাঁড়িয়ে পিয়নের সঙ্গে কথা বলছে। দেখামাত্র স্থির হয়ে গেল লিলি, ছলকে উঠল বুকের রক্ত। মনে হলো যেন কত যুগ ধরে ওকে খুঁজছে সে। তারপরই একটা তীব্র অভিমান এসে আঘাত করল। অবহেলা অপমান যত সূক্ষ্মই হোক, মেয়েরা এ-সব খুব সহজেই ধরে ফেলতে পারে। লিলি বুঝতে পারে না শাহিন নামের এই

অদ্ভুত ছেলেটা বছরের পর বছর ধরে কেনই বা তার পিছনে লেগে থাকল, তারপর সে যখন দুর্বল হয়ে পড়ল তখনই বা কেন তাচ্ছিল্য দেখিয়ে দূরে সরে গেল।

ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে শাহিন, ফলে দেখতে পায়নি। একে একে অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে লিলির। শেষবার কথা হয়েছিল বছর···হ্যাঁ, এক বছর তো হবেই। তাকে দেখে সে-ই এগিয়ে যায়, হাসিমুখে বলে, 'কেমন আছেন? একটা কথা বলার জন্যে মনে মনে খুঁজছিলাম আপনাকে।'

'কি কথা?' জানতে চায় শাহিন, কেমন যেন ভয়ে ভয়ে তাকায় সে।

'কবে কি ঘটেছে, সে-সব আমি ভুলে গেছি,' বলল লিলি। কথাটা বলার কারণ হলো, এর আগে যতবারই দেখা হয়েছে, তার সম্পর্কে ওর ভুল ধারণাটি ভাঙার চেষ্টা করেছে শাহিন। এতদিন পাত্তা দেয়নি লিলি, যদিও মনে মনে ঠিকই জানত স্কুল জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাটায় শাহিনের ভূমিকা ছিল উদ্ধারকর্তার। পরবর্তী জীবনে উদ্ধারকর্তার এই ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছে সে, যদিও আড়াল থেকে চুপিচুপি।

'ও···বেশ···ঠিক আছে···খুশি হলাম,' থেমে থেমে জবাব দিল শাহিন, যেন অনেক চিন্তা-ভাবনা করে শব্দগুলো মাথা থেকে বের করল। 'একটু তাড়া আছে, এখন যাই, কেমন?' বলে আর দাঁড়ায়নি সে। তারপর আরও কয়েকবার দেখা হয়েছে ওদের, কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলেনি শাহিন, দূর থেকে দেখেই সরে গেছে, কিংবা দেখেও না দেখার ভান করে থেকেছে।

তারপর ছেলেটা সম্পর্কে নিজের গরজেই খোঁজখবর নিতে শুরু করে লিলি। সে বিরাট এক ধনী পরিবারের ছেলে, জানার পর মনটা খারাপ হয়ে যায় ওর। শাহিনের অদ্ভুত আচরণের কারণ এতদিনে আন্দাজ করতে পারে ও। ওর ধারণা হয়, অসম্ভব ধনী বলেই এত বেশি গর্ব তার, আর সেই গর্বের কারণেই ওকে অবহেলা করছে। এরপর লিলির আচরণেও

আড়ষ্ট একটা ভাব এসে যায়। যেচে পড়ে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার যে প্ল্যানটা মনে মনে তৈরি করেছিল, বাতিল করে দেয় সেটা। বুঝতে পারে, ধনী বলেই নিজের চারদিকে নিরেট একটা বেড়া তৈরি করেছে ছেলেটা। তার বোধহয় সন্দেহ, সব মেয়েই টাকার লোভে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইবে।

কিন্তু আজ হঠাৎ তাদের অফিসের সিঁড়িতে শাহিনকে দেখে সব কথা ভুলে গেল লিলি। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মনস্থির করে ফেলল সে, তারপর খুক করে কেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করল শাহিনের। সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই বলল, 'কেমন আছেন?'

যাকে দেখেই মনে হয় চিনি, সেই ছেলেটাকে অনেকদিন পর আজ আবার দেখতে পেল শাহিন। মতিঝিলে একটা কাজে এসেছে সে, একটা ঝকঝকে গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে দেখল। ছেলেটার চেহারাই এমন যে একবার দেখলে ভোলা সম্ভব নয়।

কাজ থাক বা না থাক, সময় পেলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে শাহিন। হাঁটতে খুব ভাল লাগে তার। মাসে অন্তত একবার হলেও পুরোটা ঢাকা শহর চক্কর দেয় সে। হাঁটার মধ্যে যে কি আনন্দ, তা কাউকে বলে বোঝাবার নয়। তার জন্ম যদিও চট্টগ্রামে, চাটগাঁর প্রতি আলাদা একটা টান আছে, তবে এখানে মানুষ হয়েছে বলে নিজের শহর বলতে ঢাকাকেই বোঝে সে। ঢাকার নিন্দা করার এক কোটি কারণ আছে, তবু রাজধানীকে ভালবাসে সে। ভালবাসে এখানকার মানুষকে। আর যাদেরকে ভালবাসে তাদেরকে হৃদয় দিয়ে দেখতে ও বুঝতে হলে হাঁটার কোন বিকল্প নেই। হাঁটার এই অভ্যেসটার জন্যে শাহিন তার রেহান ভাইয়ের কাছে ঋণী, কৈশোরেই সে তাকে শহরটা চিনিয়ে দেয়। রেহান ভাইয়ের কথা মনে পড়লে মেজাজটা খারাপ হয়ে যায় তার। প্রেস্টিজ আর প্রফিট লোকটাকে

আজ কোথায় নিয়ে গেছে। অভাব তাদের কোনদিনই ছিল না, তবে ব্যবসা করতে নেমে খুব ভাল প্রফিট করেছিল বলে শুনেছে শাহিন। ক'দিন আগে শুনল, ইদানীং নাকি তার ব্যবসা খুব খারাপ যাচ্ছে। রেহান ভাই সত্যি অসুবিধের মধ্যে আছে কিনা জানার জন্যেই আজ তার মতিঝিলে আসা। ঠিকানা জানা আছে, খুঁজে নিতে পারবে।

মতিঝিলের ফুটপাথ ধরে হাঁটছে শাহিন, হঠাৎ করেই একটা লাল হোণ্ডা সিভিকের ওপর চোখ পড়ল। গাড়ি চালাচ্ছে সুদর্শন সেই তরুণ। আজ শুধুই চোখের দেখা দেখল, এর আগে প্রতিবার খুব কাছ থেকে, কোন না কোন ঘটনার মধ্যে দেখেছে। বেশিরভাগই এক থেকে দেড় বছর আগের ঘটনা। ঘটনাগুলো মনে রাখলে ছেলেটার চরিত্র সম্পর্কে একটা রহস্য সৃষ্টি হতে বাধ্য। শাহিন বুঝতে পারে, ছেলেটা তার গবেষণার একটা বিষয় হতে পারে।

প্রথমদিন তাকে বিজয়নগরে দেখে, একটা চীনা লঞ্চিতে। ওখানকার এক বাঙালী কর্মচারীর সঙ্গে গোপন লেনদেন চলছিল তার। ওদের আলাপ না শোনার ভান করে নিজের নিয়ে আসা প্যান্ট-শার্টের পকেট হাতড়াচ্ছিল শাহিন, ভেতরে কিছু রয়ে গেছে কিনা দেখার জন্যে। কমপ্লিট এক সেট স্যুট নিয়ে বেরিয়ে গেল তরুণ, কর্মচারীর হাতে একশো টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে। কি ঘটে গেল, বুঝতে অসুবিধে হয়নি শাহিনের। অন্য লোকের স্যুট একশো টাকা দিয়ে দিন কয়েকের জন্যে ভাড়া নিয়ে গেল তরুণ। তেমন গুরুত্ব দেয়নি সে। ভেবেছিল, ছেলেটা হয়তো চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাবে, কিংবা কোন ধনী বন্ধুর বিয়েতে, যেখানে স্যুট ছাড়া যাওয়া চলে না। কিন্তু ওকে তার চেনা চেনা লাগল কেন? কোথায় দেখেছে? যেন নামটাও জানে, কিন্তু মনে পড়ছে না।

দ্বিতীয়বার ছেলেটাকে একটা মোটর মেকানিকের গ্যারেজে দেখতে পায় শাহিন। ওদের নিজেদের গাড়ি দুটো—একটা মাইক্রোবাস, একটা

কার। মেরামতের কাজ করানোর জন্যে মাইক্রোবাসটা গ্যারেজে দেয়া হয়েছে। গ্যারেজ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, আরও দু'দিন পর ডেলিভারি দেয়া হবে, তার আগে সম্ভব না। কিন্তু হঠাৎ সিদ্ধান্ত হয়েছে মেজো ভাবী রাজশাহী যাবেন, মাইক্রোবাসটা লাগবে। শাহিনের মেজো ভাই রাজশাহী থেকে ফিরে আসছেন, ঢাকা ভার্সিটিতে চাকরিটা হয়ে গেছে তাঁর। রাজশাহীতে বেশ অনেকদিন আছেন, কেনাকাটা কম করেননি, সে-সব আনার জন্যেই মাইক্রোবাসটা দরকার। মেজো ভাবীর তাগাদা, বাধ্য হয়ে গ্যারেজে খবর নিতে এসেছে শাহিন।

গ্যারেজে এসে মাইক্রোবাসটা কোথাও দেখতে পেল না। মেকানিক লোকটা ওকে দেখে কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়ল। নিজে থেকেই বলল, তার একজন হেলপার গাড়িটা টেস্ট করতে নিয়ে গেছে। শাহিন বলল, সে অপেক্ষা করবে। কিন্তু লোকটা তাকে বারবার একই কথা বলছে, 'স্যার, কষ্ট করনের দরকার কি, বাড়ি চইলা যান—হেলপাররে দিয়া আজই আমি গাড়ি পাঠায়া দিমু।'

শক্ত বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল শাহিন, গ্যারেজের মুখে, রাস্তার দুটো দিকই এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তারপর জানাল, তার কোন কাজ নেই, কাজেই অপেক্ষা করবে।

মেকানিকের কালো চেহারা লালচে হয়ে উঠল, কিছুক্ষণ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করল সে, হেলপারদের সঙ্গে ফিসফিস করল, তারপর 'আইতাছি,' বলে পালিয়ে গেল। রাস্তা টপকে খানিক দূর হাঁটল সে, তারপর একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল। আরও প্রায় দশ মিনিট পর মাইক্রোবাসটা ফিরল। সরাসরি গ্যারেজের ভেতর ঢুকল সেটা, চালিয়ে আনল সেই সুদর্শন তরুণ। গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে গ্যারেজের লোকজন তাকে ছেঁকে ধরল, বেঞ্চ ছেড়ে শাহিনও এগোল। পকেট থেকে একশো টাকার দটো নোট বের করে বাড়িয়ে ধরল তরুণ, বলল, 'ট্যাংকে

আমার কেনা দু'লিটার পেট্রল রয়ে গেছে, কাল বিকেলেও যদি গাড়িটা একবার দিতে পারো, ভাল হয়।'

মেকানিকের এক সহকারী চোখ টিপল, কিন্তু ইঙ্গিতটা তরুণ ধরতে পারল না। লোকটার হাতে টাকাটা গুঁজে দিয়ে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে গেল সে। কি ঘটেছে, সবই বুঝতে পারল শাহিন। তার রাগ হবারই কথা, কারণ কাজটা অন্যায়, তাদের গাড়ি ভাড়া খাটাচ্ছে গ্যারেজের মালিক। তবে রাগ নয়, কৌতূহল নিয়ে তরুণের দিকে তাকিয়ে থাকল সে, একটা রিকশা ডেকে চলে যাচ্ছে। সেদিনও তার মনে হলো, ছেলেটাকে চেনে, কোথায় যেন আগেও দেখেছে। মনে হলো, এমন কি ওর নামটাও সে জানে। আশ্চর্য, ভুলে গেল কিভাবে!

পরে গ্যারেজের মালিকের সঙ্গে কথা হয়েছে শাহিনের। শুধু নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করেনি লোকটা, তার অসহায় অবস্থার কথাও ব্যাখ্যা করে বলেছে। এলাকার কয়েকটা মস্তান ওই তরুণের বন্ধু, তারা অনুরোধ করায় মাঝেমধ্যেই প্রাইভেট কার বা মাইক্রোবাস ভাড়া দিতে বাধ্য হয় সে। ভাড়া দিতে অস্বীকার করলে মস্তানরা তার ক্ষতি করবে বলে ইঙ্গিত দিয়ে গেছে।

আরেক দিন, এই মাত্র কিছু দিন আগে ধানমণ্ডিকে ডান পাশে রেখে ফুটপাথ ধরে হাঁটছে শাহিন, তার চোখের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেল। অকস্মাৎ ব্রেক করার আওয়াজ শুনে রাস্তার ওপারে তাকাল সে, দেখল বাঁক ঘুরে পাঁচ নম্বর রোডে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে একটা প্রাইভেট কার। গাড়ির পাশে রাস্তার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে এক লোক। চারদিক থেকে লোকজন ছুটল, তাদের সাথে শাহিনও।

ভিড় ঠেলে উঁকি দিতেই শিউরে উঠল শাহিন। রাস্তায় পড়ে আছে জিনস পরা এক তরুণ, তার কোমরের নিচে থেকে হড়হড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছে, কালো হয়ে গেছে জিনস। হাঁটুর ওপরটা দু'হাতে খামচে

ধরে প্রচণ্ড ব্যথায় মোচড় খাচ্ছে সে, এরইমধ্যে ধুলোয় সাদাটে হয়ে গেছে তার চুল আর মুখ। টয়োটা করোলা থেকে বেরিয়ে এসেছেন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক, নার্ভাস এবং আতঙ্কিত দেখাচ্ছে তাঁকে—গাড়িটা তিনিই চালাচ্ছিলেন। সামনের অপর সীটে বসে রয়েছেন এক প্রৌঢ়া, সম্ভবত ভদ্রলোকের স্ত্রী, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন তিনি।

ভদ্রলোক সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, দোষটা তাঁর নয়। তিনি হর্ন তো বাজিয়েছিলেনই, বাঁকটা ঘুরছিলেনও অত্যন্ত ধীরগতিতে—অ্যাক্সিডেন্ট হবার কোন কারণই ছিল না। তাঁর বক্তব্য, ছেলেটা যেন ইচ্ছে করে গাড়ির সামনে লাফিয়ে পড়ে। গাড়ির সামনের কিনারায় সামান্য একটু ধাক্কা লেগেছে, আঘাতটা এত সিরিয়াস হলো কি করে তা তিনি বুঝতেই পারছেন না। সবার সাহায্য চাইলেন তিনি, ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কান দিচ্ছে না। ভিড় থেকে আওয়াজ উঠল—মার শালাকে!

প্রধান ভূমিকা নিল তিন-চারজন তরুণ। খালি একটা টেম্পো যাচ্ছিল, সেটাকে দাঁড় করানো হলো। তাতে ধরাধরি করে তোলা হলো আহত ছেলেটাকে। জনতার রুদ্ররোষ থেকে এই তরুণরাই রক্ষা করল গাড়ির প্রৌঢ় মালিককে। ভদ্রলোককে বলা হলো—দোষ কার সেটা এখন বড় কথা নয়। বড় কথা ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে। ওর যা অবস্থা, এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে না পারলে বাঁচবে না। সবশেষে বলা হলো, 'ওর দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি, আপনি শুধু চিকিৎসার খরচটা দিন।'

তরুণদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হলেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে পাঁচশো টাকার চারটে নোট বাড়িয়ে দিলেন। তরুণদের চেহারা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। দু'হাজার টাকা? এ টাকায় তো কিছুই হবে না। একজন তরুণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে দু'হাজার টাকায় রেহাই পেতে চান আপনি? ভেবে দেখেছেন, ছেলেটা

মারা গেলে কোন বিপদে পড়বেন আপনি? রক্ত আর ওষুধ কিনতেই তো পাঁচ হাজার টাকা লাগবে, তারপর অপারেশন চার্জ, মাসের পর মাস হাসপাতালে থাকা, কেবিন ভাড়া—অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকার কমে হবে না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে সুদর্শন সেই তরুণটি, যাকে ঢাকা শহরের এখানে-সেখানে প্রায়ই দেখে ফেলছে শাহিন, চেনা চেনা লাগলেও কোথায় দেখেছে মনে করতে পারছে না।

ভদ্রলোক জানালেন, তাঁর কাছে এই মুহূর্তে আট হাজার টাকা আছে। তিনি আরও বললেন, 'তোমরা ওকে আমার গাড়িতেই তুলতে পারতে, আমিই ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতাম। ঠিক আছে, চলো, টেম্পোর পিছু নিয়ে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।'

'দিন, আপাতত আট হাজার টাকাই দিন,' সুদর্শন তরুণ বলল তাকে। তারপর সৎ পরামর্শ দেয়ার ঢঙে নিচু গলায় বলল, 'আপনি এরকম বোকামি করলে মারা পড়বেন। ভেবে দেখেছেন, ছেলেটা মারা গেলে কি অবস্থা হবে আপনার? টাকাটা দিয়ে কেটে পড়ুন, এদিকটা আমরা সামলাই। বাকি টাকা যখন যা প্রয়োজন হবে আমরা আপনার বাড়ি বা অফিস থেকে নিয়ে আসব—ঠিকানা দিন।'

স্ত্রীর পরামর্শে তরুণদের কথা মেনে নিলেন ভদ্রলোক। মানিব্যাগ খালি করে টাকাগুলো তরুণের হাতে তুলে দিলেন তিনি। ইতিমধ্যে ভিড় অনেক বড় হয়েছে, তারা যাতে ভদ্রলোককে কেটে পড়তে বাধা না দেয় সেদিকেও লক্ষ রাখল তরুণরা। টয়োটা চলে যাবার পর টেম্পোয় উঠে বসল তারা, টেম্পোও রওনা হয়ে গেল মেডিকেল কলেজের দিকে।

টেম্পো চলতে শুরু করেছে, এই সময় দর্শকদের একজন লাফ দিয়ে সেটায় ওঠার চেষ্টা করল। তরুণরা সবাই প্রায় একযোগে ধমক দিল তাকে। 'আর কারও সাহায্য লাগবে না, আমরাই সব দেখব,' বলে

ভাগিয়ে দিল তাকে।

একটা কোস্টার আসছে দেখে এক ছুটে রাস্তা পেরুল শাহিন, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল পা-দানিতে। এভাবে ওঠার জন্যে আরোহীরা তো বটেই, হেলপারও মারমুখো হলো তার ওপর। কিন্তু তাদের দিকে খেয়াল নেই শাহিনের, পা-দানিতে দাঁড়িয়ে গলাটা লম্বা করে টেম্পোকে দেখার চেষ্টা করছে সে।

নীলখেতে পৌঁছে কোস্টার থেকে নামল শাহিন। খানিকটা হেঁটে টেম্পো স্ট্যাণ্ডে চলে এল সে। খানিকটা দূর থেকে দেখল, অ্যাক্সিডেন্টে আহত ছেলেটা টেম্পোতে বসে দিব্যি সিগারেট ফুঁকছে, তার এক সঙ্গী পাশের রেস্তোরাঁ থেকে এক জগ পানি এনে দিল, জিনস থেকে রক্ত ধোয়ার জন্যে। পানির রঙ দেখে বোঝা গেল, জিনিসটা আসলে রক্ত নয়, গাঢ় রঙ। সুদর্শন সেই তরুণকে কোথাও দেখতে পেল না সে। বোধহয় রাস্তায় কোথাও আগেই নেমে গেছে। তারমানে, শাহিন বুঝল, গোটা ব্যাপারটাই ছিল অভিনয়। মিনিট কয়েকের মধ্যে বিনা পুঁজিতে আট হাজার টাকা আয় করেছে ওরা। তবে ঝুঁকিও কম ছিল না, ছেলেটা অভিনয় করতে গিয়ে সত্যি সত্যি আহত হতে পারত, এমন কি মারাও যেতে পারত। শাহিন আন্দাজ করল, ভদ্রলোকের কাছ থেকে পরে আরও টাকা আদায় করা হবে। অন্তত তরুণদের তরফ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না।

তরুণটি সম্পর্কে সর্বশেষ যে ঘটনা জানার সুযোগ হয়েছিল শাহিনের সেটা নারী সংক্রান্ত। তার বন্ধু শায়েখ, শায়েখের বন্ধু জামিল, সেই জামিলের ভাবী নির্মলার সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে দেখেছে। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, জামিলের ভাই বিদেশে চাকরি করে, তার ভাবী থাকে বাপের বাড়ি। জামিলের ভাই বিদেশ থেকে টাকা পাঠায় শ্বশুরের নামে। নির্মলার সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের বনিবনা হয় না, ফলে এমনকি আসা-যাওয়াও বন্ধ। নির্মলা

বাপের বাড়ি কেমন আছে, কি রকম দিন কাটাচ্ছে, এ-সব কোন খবরই জামিলরা রাখে না।

আজ এতদিন পর আবার ছেলেটাকে দেখে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে শাহিন। আবার সেই পুরানো প্রশ্নটা ফিরে এল মনে, কেন ওকে চেনা চেনা লাগে? কেন মনে হয়, ওর নামও এক সময় জানা ছিল?

ঠিকানা মিলিয়ে একটা বিল্ডিঙে ঢুকতে যাবে শাহিন, সে তার নার্গিস ভাবীকে বেরিয়ে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাসিমুখে অপেক্ষা করছে, চোখাচোখি হলে সালাম দেবে, কুশল জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু ওর পাশ ঘেঁষে ছুটে গেল যেন হিংস্র একটা বাঘিনী। দরজা খুলে অপেক্ষা করছিল ড্রাইভার, প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ল তার নার্গিস ভাবী, দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। সেদিকে তাকিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল শাহিন। গাড়িটা চলে গেল, তারপরও নড়ল না সে।

তাদের পাড়ার রেজওয়ান চৌধুরীর মেয়ে এই নার্গিস। তার এক ভাই ছাড়া গোটা পরিবারটাই বিদেশে বসবাস করে, দু'চার বছর পরপর ইচ্ছে হলে বেড়াতে আসে দেশে। সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে শাহিনের। সেবারও ছোট মেয়ে নার্গিসকে নিয়ে আমেরিকা থেকে দেশে বেড়াতে এসেছেন রেজওয়ান চৌধুরী, ইচ্ছে মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইকেও আমেরিকায় নিয়ে যাবেন। একের পর এক পাত্র দেখা চলছে, কিন্তু তেমন মনের মত পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। যা-ও বা দু'একটা পাওয়া গেল, ওদেরই পাড়ার এক যুবক অর্থাৎ শাহিনের রেহান ভাই পাত্রী সম্পর্কে আজেবাজে কথা রটিয়ে ভাগিয়ে দিল তাদের। কে যেন রেহান ভাই অর্থাৎ রায়হান চৌধুরীকে বুদ্ধি দিয়েছে, মিলিওনেয়ার ফ্যামিলির ছোট মেয়ে নার্গিস, তাকে বিয়ে করতে পারলে প্রফিট আর প্রফিট। তাছাড়া, অভিজাত চৌধুরী বংশের মেয়ে, এ মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে রেহান ভাইয়ের প্রেস্টিজ বেড়ে আকাশ ছোঁবে।

এ-ব্যাপারে রায়হান চৌধুরীর বাবাও ছেলেকে খানিকটা প্রশ্রয় দিলেন, হালকা রসিকতার ছলে বারবার প্রসঙ্গটা তুলে। কিন্তু মুশকিল হলো, দুই পরিবারেরই প্রফিট আর প্রেস্টিজ জ্ঞান টনটনে। রেজওয়ান চৌধুরী চাইছেন তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন অভিজাত ধনী কোন পরিবারের ছেলের সঙ্গে। তাঁর দৃষ্টিতে রায়হান চৌধুরীদের আভিজাত্য তো নেইই, টাকা থাকলেও তা খুব বেশি নয়। একা শুধু তিনি নন, নার্গিস নিজেও রায়হানকে পছন্দ করছে না।

এদিকে রায়হান চৌধুরীও নাছোড় ভূমিকা নিয়ে বসল। তাকে সাহায্য ও উৎসাহ যোগাল পাড়ার মস্তানরা। রায়হানের বাবা প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। তিনি এমন সুরে কথা বললেন, যেন মেয়ে পক্ষের রাজি হওয়া না হওয়ার কোনই গুরুত্ব নেই, তাঁর ছেলে যখন এখানে বিয়ে করতে চেয়েছে তখন এখানেই তার বিয়ে হতে হবে। প্রস্তাবের সঙ্গে কয়েকটা শর্ত দিলেন তিনি। ছেলেকে ঢাকায় ব্যবসা করার জন্যে নগদ টাকা দিতে হবে দশ লাখ, আর উত্তরায় একটা বাড়ি কিনে দিতে হবে। প্রস্তাবের সঙ্গে আরও বলা হলো, মেয়ে যেহেতু আমেরিকায় মানুষ, অন্তত দু'বছরে একবার তাকে রায়হান নিজের খরচে আমেরিকায় বেড়াতে নিয়ে যাবে। স্ত্রীর ব্যবহার্য সমস্ত জিনিসপত্র বিদেশ থেকে নিয়ে আসা হবে, তার একার ব্যবহারের জন্যে আলাদা একটা গাড়ি থাকবে, নার্গিসের সংসারে স্বামী ছাড়া তার শ্বশুরবাড়ির কেউ থাকতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রস্তাবে এ-সব যে সত্যিসত্যি ছিল, কোন বানানো গল্প নয়, শাহিন নিজে তার একজন সাক্ষি—প্রস্তাব দেয়ার সময় আরমান চৌধুরী পাড়ার কয়েকজন মস্তানকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে সে-ও উপস্থিত ছিল।

স্বভাবতই প্রস্তাবটা মেয়ে পক্ষ প্রত্যাখ্যান করল। তার পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত ও নাটকীয়। শপিং করতে বেরিয়েছে নার্গিস, সঙ্গে শুধু ড্রাইভার। পাড়ার মোড়ে গাড়িটা থামানো হলো, মারধর করে ভাগিয়ে

দেয়া হলো ড্রাইভারকে, নার্গিসকে একটা মাইক্রোবাসে তুলে হাওয়া হয়ে গেল রায়হান চৌধুরী। ঘটনাটা ঘটল মস্তান বন্ধুদের পরামর্শ ও সহযোগিতায়, অনেকটা কৌতুক করার ঢঙে। ভাড়া করা নির্জন একটা বাড়িতে তোলা হলো নার্গিসকে, একটা রাত আটকে রেখে সসম্মানে পৌঁছে দেয়া হলো বাড়িতে। রাতটুকু একই ঘরে বসে কাটিয়েছে ওরা দু'জন, তবে রায়হান চৌধুরী নার্গিসকে কোন রকম অপমান করেনি।

নার্গিসকে অপহরণ করায় কাজ হলো। রেজওয়ান চৌধুরী ব্যাপারটাকে আর বেশি দূর গড়াতে দিতে চাইলেন না, প্রেস্টিজ রক্ষার জন্যে বাধ্য হয়েই রায়হান চৌধুরীকে জামাই করতে রাজি হয়ে গেলেন।

বিয়েটা হয়ে গেল। বলাই বাহুল্য, বিরাট ধুমধামও হলো। বিয়ের মাসখানেক পর রেজওয়ান চৌধুরী স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকায় ফিরে গেলেন। আরও দু'মাস কাটল। তারপরই শুরু হলো ভাঙচুর। স্ত্রীকে নিয়ে আধ কি এক বেলার জন্যে রায়হান বাপের বাড়ি গোপীবাগে বেড়াতে এলেও কাচের জিনিস কোনটা আর অক্ষত থাকে না, যৌতক পাওয়া উত্তরার বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী একা থাকার সময় কি ঘটে সেটা কল্পনার বিষয়। জোর করে কিছু করলে যে তার ফল কি হয়, ওদের বিয়েটা তার একটা দৃষ্টান্ত। নার্গিস নাকি ঢাকা ক্লাবে গিয়ে—পাড়ার সেকেলে বুড়িদের ভাষায়—গা দোলায়। মানে, নাচে। আর সেকেলে বুড়োদের ভাষায়, হরদম গেলে। মানে হলো, মদ খায়। আরও শোনা গেল, প্রতি মাসে নাকি লাখ টাকা হাতখরচা দাবি করে সে।

নার্গিসকে নিয়ে অনেকক্ষণ হলো চলে গেছে গাড়ি, এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে অনেকটা সময় নষ্ট করল শাহিন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠল সে। প্রৌঢ় পিয়ন তাকে বাধা দিল, জানাল সাহেবের সঙ্গে আজ দেখা করা যাবে না। শাহিন তাকে বলল, 'আমি তোমার সাহেবের পাড়ার ছেলে, বলতে পারো ছোট ভাই—তারচেয়েও বড় কথা, আমি জানি

তোমার সাহেবের খুব বিপদ, আমাকে তার দরকার। তুমি শুধু তাকে গিয়ে আমার নামটা বলো।'

কিন্তু পিয়ন অফিসের বাইরে পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকবে, ভেতরে ঢুকতে রাজি নয়। বেশ কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর শাহিন তাকে নিয়ে দোতলার ল্যাণ্ডিঙে নেমে এসে বিশ টাকা ঘুষ সাধল। বলল, 'সঙ্গে আর টাকা নেই, থাকলে আরও বেশি দিতাম। তুমি শুধু আমার নামটা গিয়ে বলো। উনি যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে না চান, আমি চলে যাব।'

পিয়ন লোভ সামলাতে পারছে না, আবার টাকাটা নিতে ভয়ও পাচ্ছে, এই সময় কাশির শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে সিঁড়ির ওপর দিকে তাকাল শাহিন। দেখল, লিলি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লিলিকে দেখেই পালাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল শাহিন, তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পিয়নকে বলল, 'ঠিক আছে, আজ আমি যাই, পরে একদিন আসব।' তারপর নামতে শুরু করল ধাপ বেয়ে।

'দাঁড়ান, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে,' পিছন থেকে নরম সুরে ডাকল লিলি, দু'ধাপ নিচে নেমে এল। শাহিনকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখল ও, কিন্তু ঘুরল না, ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালও না। চোখ ইশারায় পিয়নকে উঠে আসতে বলল লিলি, ওকে পাশ কাটিয়ে অফিসের দিকে চলে গেল লোকটা। 'এভাবে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকলে কি কথা বলা যায়? আমার দিকে ফিরুন।'

শাহিন, খবরদার! নিজেকে সাবধান করছে সে। সময় থাকতে পালা! তারপর মনে মনেই, লিলিকে বলল, কাছে এসো না, মারা পড়বে! 'আমার তাড়া আছে, কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো।'

দু'সেকেণ্ড চুপ করে থাকল লিলি, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আমাকে এড়িয়ে চলেন কেন?'

'কই, না তো!'

'চলেন। কিন্তু কেন? আর যদি এড়িয়ে চলারই ইচ্ছে, আমার ভাল-মন্দে এত কেন মাথাব্যথা আপনার? ভেবেছেন আমি কিছু বুঝতে পারি না? ভার্সিটিতে মস্তানরা আমাকে বিরক্ত করে যেদিন, তার পরদিন এসে মাফ চায়। দরকারী একটা বই লাইব্রেরি না পেলে দু'দিন পর কে যেন সেটা আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এত ভাল ভাল নোট কে যোগান দেয় আমাকে?' রাগ নয়, লিলির গলায় অভিমান ফুটে ওঠে। 'আমি জানতে চাই, কেন? এ-সব কেন আপনি করেন?'

'আমি তো না!' বলে আবার নামতে শুরু করে শাহিন, তার গলা কেঁপে যায়।

'আপনি চলে যাচ্ছেন?' আঁতকে মত ওঠে লিলি। 'আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন না?'

'কোন জবাব নেই,' সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে ভেসে আসে কথাগুলো, তারপরই অদৃশ্য হয়ে যায় শাহিন। ধাপটার ওপর বসে পড়ে লিলি, দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে।

কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে রুমালে চোখ মোছে লিলি। রিকশায় চড়ে বাড়ি ফেরার সময় কিসের যেন প্রচণ্ড একটা অভাব বোধ করল। তারপর ভাবল, কি নেই আমার? ভেতরে কোথায় যেন বিরাট একটা শূন্যতা রয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে কেন? হঠাৎ করেই আবিষ্কার করল, ওর জীবনে প্রেম নেই। ও কাউকে ভালবাসে না, ওকে কেউ ভালবাসে না। ও ভালবাসে না, ভালবাসে না ইচ্ছে করেই। নিজেকে জানিয়ে দিয়েছে নিজের পায়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত কাউকে ভালবাসা বারণ। বাবার স্বপ্ন, মায়ের সাধ ওকে পূরণ করতে হবে; কাকাদের দেখাতে হবে ব্যবসা করে সে-ও পারে ঢাকা শহরে গাড়ি-বাড়ি করতে। বেশ, নিজেকে তুমি সামলে রেখেছ। কিন্তু ঢাকার ছেলেরা? তারা কেন কেউ তোমাকে ভালবাসে না?

ক্ষীণ হলেও, একটা হীনম্মন্যতা জাগল লিলির মনে। আমি কি দেখতে সত্যি খুব খারাপ? দেখতে খারাপ, না আচরণে বিরাট কোন ত্রুটি আছে বলে ছেলেরা আমার ধারেকাছে ঘেঁষতে চায় না? আজেবাজে মন্তব্য করার, লোলুপ দৃষ্টিতে তাকানোর, অন্যায় সুযোগ নেয়ার জন্যে আশপাশে ঘুর ঘুর করার ছেলের অভাব কোনদিন হয়নি, কিন্তু ভালবাসা নিয়ে কাছে এসেছে এমন ছেলে একজনকেও পায়নি লিলি।

একুশ বছরের জীবনে আজই প্রথম নিজের ভেতর একটা হাহাকার ধ্বনি শুনতে পেল। অবাক লাগছে লিলির। খানিকটা দিশেহারা বোধ করছে। নিজেকে মনে হচ্ছে বঞ্চিত।

আশ্চর্য, আজ পর্যন্ত কেউ ওকে ভালবাসতে পারল না!

চার

লাবণী আহমেদ নিজের লেখা একটা পাণ্ডুলিপি বাংলা একাডেমীতে জমা দিয়ে রিকশা করে বাড়ি ফিরছেন। আগেও একটা পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলেন, আর ক'দিন পর একুশের বই মেলা উপলক্ষে সেটা ছাপা হচ্ছে। আজ যেটা জমা দিলেন সেটা মনোনীত হলে আগামী বছর ছাপা হতে পারে। যেটা বেরুবে সেটার নামকরণ করা হয়েছে—বন্দিনী নারী, প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ। মেয়েদেরকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিলে তারা বিপথগামী হতে পারে, এই ভয়ে সমাজ তাদেরকে এই যে চিরকাল ক্রীতদাসী বানিয়ে রেখেছে, তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত

লিখেছেন তিনি। দ্বিতীয় বইটির নাম—অপেক্ষা এখানে অপরাধ। এই বইটিতে তিনি বঙ্গললনাদের উদ্দেশ্য করে বলতে চেয়েছেন, পুরুষশাসিত সমাজে কেউ তোমাকে পুরস্কার হিসেবে নারীস্বাধীনতা ঘর বয়ে দিয়ে যাবে না, যে যার পছন্দ ও যোগ্যতা মত কাজ খুঁজে নিয়ে, কাজের মধ্যে থেকে, আদায় করে নিতে হবে ওটা।

ঝাঁঝাল দুপুর, রাস্তায় লোকজন কম। হাইকোর্টের সামনে দিয়ে এগোচ্ছে রিকশা। হঠাৎ রিকশার সামনে লুঙ্গি পরা এক লোক এসে দাঁড়াল, দেখে মনে হলো রাস্তা পেরুতে চায়, খেয়াল না করায় রিকশার সামনে পড়ে গেছে। খুব জোরেই ব্রেক করল রিকশাঅলা, ফলে দুর্ঘটনা ঘটল না। 'এই মিয়া, চোখে দেহো না?' খেঁকিয়ে উঠল ঘর্মাক্ত রিকশাঅলা।

কিছুই সন্দেহ করেননি লাবণী আহমেদ। লোকটা রিকশার সঙ্গে ধাক্কা খায়নি দেখে স্বস্তিবোধ করছেন তিনি। এই সময় পিছন থেকে হাত পড়ল তাঁর গলায়। সোনার লকেটটা খপ করে ধরেই হ্যাঁচকা টান দিল কেউ, ছিঁড়ে গেল চেইন, ব্যথা পাওয়ায় কাতর একটা ধ্বনি বেরিয়ে এল তাঁর গলা থেকে। নেকলেসটা ছিনতাই হয়ে গেছে বুঝতে পেরে ব্যথার কথা ভুলে চিৎকার জুড়ে দিলেন তিনি, 'চোর, ছিনতাই, বাঁচান!' গলায় হাত দিয়ে রিকশা থেকে নেমে পড়েছেন, পিছন তাকিয়ে দেখলেন লুঙ্গি পরা অপর এক লোক শিশু একাডেমীর পাশ ঘেঁষে ছুটছে। তার সঙ্গে প্রথম লোকটাও রয়েছে।

সাদা একটা ডাটসান দেখা গেল রাস্তার উল্টোদিকে। হঠাৎ ব্রেক করা হয়েছে, কংক্রিটের সঙ্গে টায়ারের ঘষা লাগায় তীক্ষ্ণ শব্দ উঠল। গাড়ির জানালা থেকে মুখ বের করে এক ড্রাইভার জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

ইতিমধ্যে চারদিক থেকে ছুটে এসেছে কিছু লোক, কিন্তু কেউই তারা

কিছু করছে না। লাবণী আহমেদ কেঁদে ফেললেন, কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'আমার নেকলেস···আপনারা একটু চেষ্টা করলে এখনও ওদেরকে ধরা যায়···।'

ডাটসান আবার চলতে শুরু করল। একা শুধু লাবণী আহমেদ নন, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই দেখল ছিনতাইকারী দু'জনের পিছু ধাওয়া করছে গাড়িটা। তারপর সেটা দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচে নামল স্যুট পরা এক লোক, রাস্তা পেরিয়ে শিশু একাডেমীর গেটের দিকে আসছে। তাকে আসতে দেখে অপরাধীরা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল, মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে।

'চলুন, দেখা যাক,' বলে লাবণী আহমেদকে নিয়ে সেদিকে এগোল কয়েকজন পথিক। খানিকটা এগোতেই অপরাধী আর ডাটসানের ড্রাইভারকে দেখতে পাওয়া গেল। ড্রাইভার নাছোড়বান্দা, বুঝতে পেরে রুখে দাঁড়িয়েছে অপরাধীরা। বিকট শব্দে দুটো বোমা ফাটল। একজনের হাতে চকচকে একটা ছোরাও দেখা গেল। কিন্তু এ-সবে একটুও ভয় পাচ্ছে না ডাটসানের ড্রাইভার। সে অত্যন্ত সাবধানে, ধীরে ধীরে সামনে এগোচ্ছে। লাবণী আহমেদকে ঘিরে রেখেছে যারা, এবার ড্রাইভারের সাহায্যে তারাও শিশু একাডেমীর ভেতরে ঢুকে পড়ল। আরেকটা বোমা ফাটল। ভয়ে কেঁদে উঠলেন লাবণী আহমেদ, চিৎকার করে ড্রাইভারকে বললেন, 'নেকলেস দরকার নেই, তুমি বাবা ফিরে এসো।'

বহুলোক ছুটে আসছে দেখতে পেয়ে ছিনতাইকারীরা বুঝতে পারল, আজ তাদের রক্ষা নেই। কি যেন একটা ছুঁড়ে দিল দ্বিতীয় লোকটা, তারপর খেঁচে দৌড়। চোখের পলকে বিল্ডিংটার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

ডাটসানের ড্রাইভার ঘাসের ওপর থেকে কিছু একটা কুড়িয়ে নিল, হন হন করে ফিরে আসছে গেটের দিকে। নেকলেসটা ফিরে পাচ্ছেন ধরে

নিয়ে প্রৌঢ় ভদ্রমহিলা নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করলেন। গেটের দিকে তিনি আর এগোলেন না, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানেই অপেক্ষায় থাকলেন। ভাবছেন ডাটসানের মালিককে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাবেন। দূর থেকে দেখলেও, বয়েস কম বলেই মনে হয়েছে—দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবক।

গেট থেকে বেরিয়ে কোন দিকে তাকাল না সে, রাস্তা পেরিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে পড়ল। রাস্তায় বহু লোকের ভিড় জমে গেছে ইতিমধ্যে, তারা সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। একটু পরই ফিসফাস শুরু হলো, যদিও কেউ কিছু করার কথা ভাবল না। ইতিমধ্যে ডাটসান চলতে শুরু করেছে, স্পীড বাড়িয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

লাবণী আহমেদকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো এক একজন এক এক রকম মন্তব্য করছে। কেউ বলছে, দোষ তো আমাদেরই, আমরা কেন ছোকরাকে বাধা দিলাম না! আরেকজন বলল, আমরা বাঙালী তো, আমাদের বুদ্ধি বাড়ে চোর পালালে। একজন বলল, কি করে বুঝব বলুন চোরের ওপর বাটপাড়ি হচ্ছে। এদিককারই একজন পান দোকানদার বলল, 'এইডা হইল গিয়া ভার্সিটি এলাকা, আর আমগো ছাত্ররা হইল গিয়া দ্যাশের সবচাইতে বড় বিপদ···বাকিটা কইবার চাই না।' কালো কোট গায়ে শ্মশ্রুমণ্ডিত এক ভদ্রলোক মুখে অমলিন হাসি ফুটিয়ে সান্ত্বনা দিলেন, 'মহান আল্লাহর কাছে হাজারো শোকর করুন, আপনাকে ওরা ছুরি মারেনি, শুধু নেকলেসটা নিয়ে গেছে। মেয়েদের এভাবে একা একা বেরুনোই তো উচিত নয়, তাই না?'

লাবণী আহমেদের ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক রয়েছে, প্রায় ধরা যায় না, সে-সম্পর্কেও একটা খোঁচা মারতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু তার আগেই একটা গুঞ্জন উঠল ভিড়ের মধ্যে, এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে লাবণী

আহমেদের ঠিক সামনে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করল ডাটসানটা।

গাড়ি থেকে নেমে তাঁর সামনে মুঠো খুলল তরুণ ড্রাইভার। 'শিশু একাডেমীর পিছন দিকটা দেখে এলাম, কিন্তু কোথাও ওদেরকে পেলাম না—পালিয়েছে।' হাতঘড়ি দেখল সে, তারপর আবার বলল, 'আমার জরুরী একটা কাজ আছে, তাই আপনাকে পৌঁছে দিতে পারছি না···আম্মু, আপনি থাকেন কোথায়?'

আম্মু? লাবণী আহমেদ ভাবলেন, তার কি শুনতে ভুল হলো? 'এই তো, কাছেই···,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি, তরুণের হাতের তালু থেকে নেকলেসটা নিয়ে হাতব্যাগের মুখ খুললেন।

'কাছে হলে আসুন, আপনাকে পৌঁছে দেই···।'

'না বাবা, পৌঁছে দিতে হবে না, আমি একটা রিকশা নিয়ে চলে যেতে পারব। তুমি বাবা যা করলে··· ।'

এই সময় তরুণের চোখ পড়ল লাবণী আহমেদের গলার ওপর। 'সর্বনাশ। আম্মু, আপনার গলা দেখছি কেটে গেছে!' সত্যি তাই, কালো গলায় লাল একটা লম্বা দাগ ফুটে উঠেছে। 'সংকোচ করবেন না, আসুন আমার সঙ্গে। প্রেস ক্লাবের উল্টো দিকে ডাক্তারখানা আছে।'

তরুণের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন লাবণী আহমেদ। ভুল শোনেননি তিনি, ছেলেটা তাঁকে সত্যি সত্যি আম্মু বলছে। তাঁর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। আজ যদি তাঁর একটা ছেলে থাকত, সে-ও ঠিক এভাবে তাঁকে··· । সমস্ত দ্বিধা আর সংকোচ ঝেড়ে ফেলে সাদা ডাটসানে উঠে পড়লেন তিনি।

আজ বৃহস্পতি, আধবেলা অফিস। রিকশা থেকে নামার আগেই গাড়িটা দেখতে পেল লিলি। শুধু গাড়ি নয়, গাড়ির মালিককেও। আর দেখামাত্র

ওর শরীরে একটা পুলক খেলে গেল। অ্যাশ কালারের স্যুট পরা দীর্ঘদেহী তরুণও দেখল ওকে। যতক্ষণ একটা অচেনা মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলে অমার্জিত বলে মনে করা হয় না, বোধহয় তারচেয়ে এক সেকেণ্ড বেশি তাকিয়ে থাকল সে, তারপর নিজের অন্যায়টা ধরতে পেরেই যেন তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল, দরজা খুলে উঠে পড়ল গাড়িতে।

রিকশা থামল, নিচে নামল লিলি, ভাড়া দেয়ার জন্যে হাতব্যাগ খুলল, সবই দম দেয়া পুতুলের মত করে যাচ্ছে; একটিবারের জন্যেও তরুণের দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না। ওর হার্টবিট অসম্ভব বেড়ে গেছে, ঘামতে শুরু করেছে হাতের তালু, ঝাঁ ঝাঁ করছে কান, যেন তরুণ তাকে জাদু করেছে। কোন ছেলেকে দেখে আগে কখনও এরকম হয়নি ওর। তবে এর আগে কখনও এরকম সুদর্শন ছেলে দেখেওনি। শুধু সুদর্শন আর সুপুরুষ নয়, চেহারায় আশ্চর্য একটা আভিজাত্য আছে, হাবভাবে আছে পরিশীলিত ভাব—অত্যন্ত স্মার্ট অথচ দুর্বিনীত নয়, প্রতিটি নড়াচড়ায় ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে অথচ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাধারণত যে গর্ব আর অহংকার থাকে তার ছিটেফোঁটাও নেই। মুগ্ধ চোখে, নির্লজ্জের মত তাকিয়ে থাকলেও, নিজেকে শাসন করার কম চেষ্টা করছে না লিলি। ছি-ছি, না জানি কি ভাবছে ছেলেটা তাকে! লিলি, তোর হলো কি! বেহায়াপনার একটা সীমা থাকা উচিত। যদিও এ-সবে কোন কাজ হচ্ছে না। সেই যে চোখ পড়েছে, তারপর আর ফিরিয়ে নিতে পারল না ও।

মাথা নিচু করে স্টার্ট দিল তরুণ, ছেড়ে দিল গাড়ি। এক পলকের জন্যে আরেকবার লিলির দিকে তাকাল সে, যেন লিলির অদ্ভুত দৃষ্টি অনুভব করতে পেরে বিব্রত বোধ করছে। যতক্ষণ দেখা গেল, গাড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল লিলি। হুঁশ ফিরল রিকশাঅলার কথায়, 'আফা, ভাড়া দেন।'

বাড়িতে ঢোকার সময় লিলি ভাবল, ছেলেটা বোধহয় ওদের

নিচতলার ভাড়াটে পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর জসিম সরকারের কাছে এসেছিল। জসিম সরকার আজ পনেরো বছর ধরে ওদের বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে আছেন, সম্পর্কটা ভালই ছিল, বছর দুয়েক ধরে শত্রুতায় পরিণত হয়েছে। অনেক দিন থেকেই ভাড়া বাড়াবার কথা বলা হচ্ছিল, চাপ দেয়া হয় গত বছর, সেই থেকে ভাড়া দেয়াই বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। পাল্টা হুমকি দিয়ে বলেছেন, তাঁর পিছনে গোটা পুলিশ বাহিনী আছে, কাজেই তাঁকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা হলে পরিণতি খারাপ হবে। এখানে সেখানে দেন-দরবার করেও কোন লাভ হয়নি, অবশেষে বাধ্য হয়ে মামলা করার কথা ভাবছে ওরা।

দোতলায় উঠে কলিংবেল বাজাল লিলি। দরজা খুলে দিল কাজের বুয়া। 'মা কোথায়?' অবাক হয়ে জানতে চাইল লিলি। অফিস থেকে মেয়ের ফেরার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে থাকেন লাবণী আহমেদ, কলিংবেল বাজলে ছুটে এসে তিনি নিজেই দরজা খুলে দেন।

'আম্মার শরীল খারাপ, শুইয়া আছেন।'

তাড়াতাড়ি বেডরুমে চলে এল লিলি। 'কি হয়েছে, মা? দেখে গেলাম ভাল, শরীর খারাপ হলো কখন?'

শুয়েই ছিলেন লাবণী আহমেদ, মেয়েকে দেখে হাসতে হাসতে উঠে বসলেন। মাকে হাঁপাতে না দেখে অবাক হলো লিলি, কারণ জানে হাঁপানি ছাড়া অন্য কোন অসুখ নেই তাঁর।

'শোন, আজ কি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে বলি তোকে···।'

বিছানায় বসে মাকে জড়িয়ে ধরল লিলি। 'আগে বলো তুমি এ-সময় শুয়ে ছিলে কেন? কি হয়েছে তোমার?'

'আম্মারে ছিনতাই করছিল···,' দোরগোড়া থেকে মন্তব্য করল কাজের বুয়া।

'কী-ই-ই?'

হেসে ফেললেন লাবণী আহমেদ। 'আরে না, আমাকে নয়! নেকলেসটা। শোন, প্রথম থেকে বলি…,' শুরু করলেন তিনি।

সেই যে শুরু হলো, খাওয়াদাওয়ার পর সেই বিকেল, তারপর সন্ধে পর্যন্ত প্রায় একটানা চলল ব্যাপারটা। ইতিমধ্যে প্রায় পঁচিশ বার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনাটা শোনা হয়ে গেছে লিলির। ওর নিজের আচরণও ওকে কম বিস্মিত করছে না। যত শুনছে ততই শুনতে ইচ্ছে করছে। ইতিমধ্যে সব প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে ওর। ছেলেটার নাম ইকবাল, আসিফ ইকবাল। সিলেট, খুলনা আর চট্টগ্রামে ব্যবসা আছে, ঢাকাতেও নতুন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি দিয়েছে। অনার্স পাস করেছে চট্টগ্রাম ভার্সিটি থেকে। ছেলেটার মা-বাপ-ভাই-বোন কেউ নেই। মাকে হারিয়েছে একেবারে ছোটবেলায়, চেহারাটা আবছা মত মনে পড়ে, তা নাকি প্রায় হুবহু লাবণী আহমেদের মত। সেজন্যেই তার আবদার, তাঁকে সে আম্মু বলে ডাকবে। আগামী কাল দুপুরে তাকে বাড়িতে খেতে ডেকেছে মা। ছেলেটা ঠিক কথা দেয়নি, তবে বলেছে সময় পেলে অবশ্যই আসবে। ওর মায়ের ভাষায়, এমন ছেলে আজকালকের দিনে হয় না। গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে তাঁর চিকিৎসা করিয়েছে সে, ডাক্তারের বিল আর ওষুধের পয়সা মাকে দিতে দেয়নি। তারপর পৌঁছে দিয়েছে বাড়িতে। নিজের কাজ ছিল, তারপরও মার অনুরোধ ফেলতে না পেরে বেশ কিছুক্ষণ পাশে বসে গল্প করে গেছে। মার তাকে এত ভাল লেগে গেছে যে নিজেদের পারিবারিক সমস্যাগুলোও গোপন করেনি, কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলেছে।

লিলির আশ্চর্য লাগছে এই ভেবে যে এত ভাল শ্রোতা কবে থেকে হলো ও। রাতে খেতে বসেও বক বক করে যাচ্ছেন লাবণী আহমেদ, প্রথমবার যেমন মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল সেই একই মনোযোগের সঙ্গে তাঁর প্রতিটি কথা শুনছে ও। শুনছে, আর প্রতি মুহূর্তে ছেলেটার চেহারা দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে।

পরদিন সকাল থেকে প্রস্তুতি শুরু হলো। ইকবাল আসবে, লাবণী আহমেদ তাকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবেন। রান্নাঘরে লিলিও প্রায় সারাক্ষণ থাকল, সাহায্য করল মাকে। মন খারাপ হতে শুরু করল দুপুরের পর থেকে। আসার সময় পার হয়ে গেল। লিলি ভাবল, অন্তত একটা টেলিফোন করবে না?

কিন্তু না, বিকেল পেরিয়ে গেলেও কোন টেলিফোন এল না। তিনটের পর আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না বুঝতে পেরে খেয়ে নিয়েছে ওরা। টেলিফোন এল সন্ধ্যার খানিক পর। রিসিভার তুলল লিলি। 'হ্যালো?'

'আমি ইকবাল, আপনি কে বলছেন?'

'লিলি। একটু ধরুন, মাকে দিচ্ছি।'

মেয়ের হাত থেকে রিসিভার নিলেন লাবণী আহমেদ। 'তুমি বাবা এলে না কেন? আমরা তোমার জন্যে···।'

অপরপ্রান্ত থেকে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে ইকবাল বলল, 'সত্যি আমি দুঃখিত। আসলে আজ ওভারটাইমের সাপ্তাহিক পাওনা দেয়ার দিন তো, ফ্যাক্টরিতে আমার না থাকলে চলে না, তাই···।'

বেশ অনেক্ষণ কথা হলো। মায়ের পাশে বসে চুপচাপ শুনছে লিলি। আগামী শুক্রবারে আবার তাকে নিমন্ত্রণ করলেন লাবণী আহমেদ। ম্লান গলায় ইকবাল জানাল, এভাবে দাওয়াত দিলে তাকে বিপদে ফেলা হবে। তারপর অভিমানের সুরে সে বলল, 'তাছাড়া, যখন ইচ্ছে হবে তখনই আমি আমার আম্মুকে দেখতে যাব—দাওয়াত তো মানুষ পরকে দেয়। আমি কি আপনার ছেলে নই?'

এক হপ্তা পেরিয়ে গেল। তারপর দু'হপ্তা। ইকবাল আর আসে না। তবে দু'একদিন পরপরই লাবণী আহমেদকে টেলিফোন করে সে। এমন সময় করে, লিলি তখন অফিসে। অফিস থেকে ফিরতে যা দেরি, মার কাছ থেকে সবিস্তারে সব শোনার সুযোগ হয় ওর। ইকবাল কোথায় থাকে, কি

খায়, তার অবসর সময় কিভাবে কাটে, তার ব্যবসায়ী বন্ধুদের কার কি নাম, তার পছন্দ অপছন্দ, ইত্যাদি সবই জানা হয়ে যায়।

তারপর একদিন ওদের ভাড়াটে জসিম সরকার নিজে থেকেই যেচে পড়ে বকেয়া সব টাকা দিয়ে যান লাবণী আহমেদের হাতে। পাঁচশো টাকা ভাড়া বাড়াতে বলা হয়েছিল, তিনি তিনশো টাকা বাড়াতে রাজি হয়েছেন। টাকা মিটিয়ে দেয়ার পর তিনি প্রশ্ন করেছেন, পুলিশের ডেপুটি কমিশনার সৈয়দ হাসানুজ্জামান কি রকম আত্মীয় তাঁদের? লাবণী আহমেদ এড়িয়ে যাবার মত করে জবাব দিয়েছেন, 'আত্মীয়তা বড় কথা নয়, উনি আমাদের শুভানুধ্যায়ী।'

দু'দিন পর ইকবাল ফোন করে জানতে চাইল, 'ভাড়াটে ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনাদের গোলমালটা কি মিটে গেছে?'

লাবণী আহমেদ বললেন, 'তুমি যে আমাদের কত বড় উপকার করেছ! জসিম সরকার জানতে চাইছিলেন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার আমাদের কি রকম আত্মীয়। তুমি বোধহয় তাঁকে দিয়েই বলিয়েছ?'

'উনি আমার বন্ধুর মামা।'

প্রসঙ্গ পাল্টে লাবণী আহমেদ জানতে চান, 'আচ্ছা, বাবা, তুমি আমাদের বাড়িতে আসতে চাও না কেন বলো তো? লজ্জা পাও বুঝি? মায়ের কাছে ছেলে আসবে, এতে তো লজ্জা পাবার কিছু নেই···।'

'জ্বী···না, মানে, লজ্জা না···এত ব্যস্ত থাকি যে···।'

'লিলি, আমার মেয়ে, ওর ধারণা লজ্জা পাও বলেই তুমি আসছ না। অফিস থেকে ফিরে রোজই আমাকে খোঁচা দেয় ও, বলে—কি মা, আজও তোমার ছেলে আসেনি? তোমাকে অনেক ভালবাসি তো, তাই···' গলা ছেড়ে হেসে ওঠেন লাবণী আহমেদ।

'তাহলে তো অবশ্যই একদিন আমার যাওয়া উচিত। অন্তত এ-কথা বোঝাবার জন্যে যে আমি তার প্রতিদ্বন্দ্বী নই।'

রিসিভারে ফিসফিস করেন লাবণী আহমেদ। 'তুমি এলে ওর মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। আসল ব্যাপারটা তো আমি বুঝি—আমার মুখে তোমার কথা শুনে শুনে তোমাকে দেখার খুব ইচ্ছে। আমি তো ওকে বলেই দিয়েছি, তুই এখন আর একা নোস, তোরা এখন দু'জন—আমার এক ছেলে এক মেয়ে।'

'নাহ্, এর একটা বিহিত করতেই হবে,' অপরপ্রান্ত থেকে কৃত্রিম উদ্বেগ প্রকাশ করে ইকবাল। 'আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে, এটা তো মেনে নেয়া যায় না।'

তারপর দু'জনেই হাসতে থাকে।

স্টাফরা কেউ অসুস্থ, কারও স্ত্রীর ডেলিভারি হবে, কাজেই রায়হান চৌধুরীর অনুরোধে আজ রাত আটটা পর্যন্ত অফিস করতে হবে লিলিকে। নতুন এক পার্টি ক'দিন ধরেই আসা-যাওয়া করছে, আজও তার আসার কথা আছে, যে-কোন দিন মোটা টাকার একটা এল/সি খুলতে পারে সে। ওকে অবশ্য থাকতে বলা হয়েছে অন্য এক পার্টির এল/সি টাইপ করার জন্যে। চীন থেকে এক লোক গাড়ির টায়ার আমদানি করবে, এতদিন অন্য কোথাও থেকে এল/সি খুলত—তাকে ওদের অফিসে ধরে এনেছে শাহিন সিদ্দিকী। প্রায় রোজই আসা-যাওয়া করছে সে। লিলি জানে, সে নিজেও একজন ইমপোর্টার। রায়হান চৌধুরীর সঙ্গে তার সম্পর্ক সেই ছেলেবেলা থেকে, এক সময় একই পাড়ায় থাকত ওরা। গোপীবাগে এখনও তাদের বাড়ি আছে, সেখানে তার বাবা ও ভাইরা থাকে। লিলি শুনেছে, রায়হান চৌধুরীকে 'রেহান ভাই' বলে সম্বোধন করে শাহিন। তার ওপর খুব খুশি ওর বস্, কারণটাও পরিষ্কার। হাতে মাত্র দু'লাখ টাকা আছে, অথচ স্ত্রীকে আমেরিকায় পাঠাতে লাগবে পাঁচ লাখ, এই অবস্থায় শাহিন সিদ্দিকীর আগমন ঘটেছে ওদের অফিসে। সেই বড় এক পার্টি ধরে আনে, প্রায় দশ লাখ ডলারের একটা এল/সি খোলা হয়। ইনডেন্টিং ব্যবসা শাঁখের

করাতের মত, অন্তত ক্ষেত্রবিশেষে, যেতেও কাটে আসতেও কাটে—ওই একটা পার্টির কাছ থেকে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা কামিয়েছে রায়হান চৌধুরী। এল/সি খোলা হলো, শিপমেন্টের তারিখ জানা গেল, সঙ্গে সঙ্গে পার্টির কাছ থেকে পাওনা কমিশনের টাকাও চেয়ে নিল সে। টাকাটা পেয়েই স্ত্রীকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছে, সে-ও আজ দু'মাস আগের কথা। স্ত্রীকে আমেরিকায় পাঠিয়েও যে শান্তিতে আছে সে, তা নয়। সেখান থেকে ডিভোর্সের হুমকি দিয়ে টেলিফোন আসছে মাঝে মধ্যে। নার্গিস বলতে চাইছে, সে নয়, রায়হান তাকে ডিভোর্স করবে। তা না করলে আমেরিকায় বসে তার পিছনে গুণ্ডা লাগাবে সে। সব সময় মন খারাপ করে থাকে বলে বসের ওপর খুব মায়া হয় লিলির। সঙ্গ দেয়ার অনুরোধ করা হলে এখানে সেখানে মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে বেড়াতে যায় ও—বেশিরভাগ সময় কিছু কেনাকাটা করে দু'জনে, কিংবা কোন রেস্তোরাঁয় বসে কিছু খায়। এর বেশি আর কি-ই বা করার আছে ওর।

হাত ঘড়ি দেখল লিলি। সাতটার মত বাজে। শাহিন তার পার্টিকে নিয়ে আসার কথা সাড়ে ছ'টায়। তাদের আসতে দেরি হলে ওর বাড়ি ফিরতেও দেরি হবে। তারা না আসা পর্যন্ত এল/সি টাইপ করা যাবে না। হাতে কোন কাজ নেই, একটা পত্রিকা খুলে মন বসাবার চেষ্টা করল ও।

লেখাগুলো পড়বে কি, পত্রিকার পাতায় ফুটে উঠছে ইকবালের ছবি। খানিক পর নিজের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল লিলি।

'এই, সত্যি করে বল দেখি, তুই কি ছেলেটার প্রেমে পড়েছিস?'

'কোন সন্দেহ নেই।'

'ছি-ছি, তুই তো তাকে এমনকি ভাল করে দেখিসওনি।'

'কয়েক সেকেণ্ডে যা দেখেছি তাতেই আমার পাগল হতে বাকি নেই। আবার তাকে দেখতে চাই, তার হাতে খুন হবার জন্যে—তা না হলে আমার শান্তি নেই।'

'কিন্তু সে যদি তোকে খুন না করে, মানে ভাল না বাসে?'

'তাহলে এই পাগল অবস্থা থেকে আমার মুক্তি নেই।'

'তাহলে যা, কষে আঁকড়ে ধর। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ঠিকানা আর ফোন নম্বর তো তোর মার কাছে আছেই। একদিন যা, দেখা কর, ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা চালা।'

'তার দরকার নেই। আমার মন বলছে সবকিছু আপনা থেকেই ঘটবে। আমাকে যেতে হবে না, সে-ই আসবে আমার কাছে। এসে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে।'

'কোথায় রে?'

'স্বর্গে। যাবার জায়গা আমাদের তো ওই একটাই।'

'আর যদি নরকে নিয়ে যায়?'

'যাব, তা-ও যাব। ওকে পেলে নরকেও আমি সুখী হব।'

'দেখিস।'

দরজা খোলার শব্দ হলো। ম্যাগাজিনটা সামান্য সরিয়ে তাকাল লিলি। ভেতরে ঢুকল শচিন বাবু, তার পিছু নিয়ে ওর স্বপ্নের রাজপুত্র, যাকে নিয়ে এমনকি নরকে যেতেও ওর আপত্তি নেই। কোনদিকে তাকাল না, সোজা হেঁটে এসে ঢুকে পড়ল রায়হান চৌধুরীর কামরায়। আশ্চর্য মানুষ তো, ভাবল লিলি, পাঁচ-সাত হাত দূরে শাড়ি পরা জলজ্যান্ত একটা তরুণী বসে রয়েছে অথচ সেদিকে একবার চোখ তুলে তাকালও না!

মিনিট পাঁচেক নড়ার শক্তি পেল না লিলি। তারপর চেয়ার বদল করল, সরে এল দরজার কাছাকাছি, বেরিয়ে যাবার সময় যাতে অবশ্যই ওকে দেখতে পায় ইকবাল। আরও দশ মিনিট কাটল। নিজেকে তিরস্কার করল লিলি, আরে বোকা, ওর চোখে পড়ার এতই যখন ইচ্ছে, বসের কামরায় ঢুকলেই তো হয়। অজুহাতের কোন অভাব নেই। ভেতরে ঢুকে

জিজ্ঞেস করলেই পারে, চা খাবেন?

অদ্ভুত একটা জড়তা এসে বাধা দিল ওকে। শিরদাঁড়া খাড়া করে চেয়ারটায় বসে থাকল, দু'হাতে ধরে আছে ম্যাগাজিনটা। আরও পাঁচ-সাত মিনিট পর নিজের অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এল রায়হান চৌধুরী, পাশে ইকবাল। কথা বলছে দু'জন। লিলির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল ইকবাল। এই প্রথম তার গলার আওয়াজ শুনতে পেল লিলি, ভরাট পুরুষালি একটা কণ্ঠস্বর ঘন ঘন টোকা দিয়ে বাজাল, ওর শরীরটা যেন গিটারের একটা তার। 'আমি কাল বা পরশু আবার আসব, চৌধুরী সাহেব,' বলল সে। 'কমিশন আপনি যা চাইছেন তাই দেব, কিন্তু চীনাদের মেশিন আমি নেব না—জাপানী হতে হবে। প্রাইস বেশি হবে জানি, তবে রীজেনেবল হওয়া চাই।'

'ঠিক আছে, টেলেক্স পাঠিয়ে দেখি। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবেন, ইক্‌বাল সাহেব, আমার তরফ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না।' হ্যাণ্ডশেক করে নিজের কামরায় ফিরে গেল রায়হান চৌধুরী।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে, চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে দাঁড়াল লিলি। অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল, ওর পিছনে অফিসের দরজা খুলে গেল। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ নেই, তাকিয়ে আছে ইকবালের দিকে।

'দেখুন তো, আমাকে আপনি চিনতে পারেন?' ইকবালের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে ও।

চোখ তুলে তাকাল ইকবাল। হাসি হাসি মুখ। একটু বিব্রত ভাবও আছে। 'আপনি···আপনাকে···।'

'আমি লিলি। এবার চিনতে পারছেন?' আবার জিজ্ঞেস করল লিলি, তারপর বলল, 'আপনাকে আমি চিনি। আপনি ইকবাল···আসিফ

ইকবাল।'

লিলির পিছনে দাঁড়িয়ে আছে শাহিন। সে ভাবছে, স্মার্ট ছোকরাটার সাথে এখানেও তাহলে আবার দেখা হয়ে গেল। কিন্তু···আসিফ ইকবাল? নামটা শুনে মাথার ভেতর কোন বেল বাজছে না কেন? বার বার মনে হয় ওকে আমি চিনি, ওর নামটাও আমার জানা—তাহলে শোনার পর কেন মনে হচ্ছে না এটাই ওর নাম?

'আপনি লিলি? ওহ্, গড! তারমানে আপনিই আমার সেই বহুল আলোচিত প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার আম্মু কেমন আছেন, লিলি?'

'কেমন ছেলে আপনি, প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে জানতে চাইছেন মা কেমন আছে?' হেসে উঠে বলল লিলি। 'একদিনও তো তাকে দেখতে গেলেন না।'

'সত্যি অপরাধ হয়েছে,' আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল ইকবাল। 'আপনি বললে আজ, এখনই যেতে পারি।'

'চলুন, ভালই হবে সেটা···,' বলেই নিজের ভুলটা ধরতে পারল লিলি। 'না, তা সম্ভব নয়। ইচ্ছে হলে আপনি যেতে পারেন, কিন্তু আমার এখানে কাজ আছে···।'

'হ্যাঁ,' পিছন থেকে বলল শাহিন, 'তোমাকে বোধহয় আমার এল/সি টাইপ করতে হবে।'

প্রায় চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল লিলি।

ইকবাল বলল, 'না, চলুন না এক সঙ্গেই যাই। আপনি কাজ শেষ করুন, আমি নিচে অপেক্ষা করছি,' বলে আর দাঁড়াল না সে, ওদের দু'জনকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

এমন অস্থির আর নার্ভাস, কাজটা করতে গিয়ে সাধারণ কয়েকটা ভুল

করে বসল লিলি। টাইপ করা এল/সি কপিটা পড়ছে শাহিন, নিজের হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে বসের কাছে বিদায় চাইল ও। শাহিন বলল, 'এক মিনিট। কয়েকটা ভুল দেখতে পাচ্ছি। সাধারণ ভুল, কিন্তু এল/সি কপিতে এরকম ভুল থাকলে পরে সিরিয়াস অসুবিধে দেখা দিতে পারে। এল/সি আমার নয়, বন্ধুর, বিশেষ করে সেজন্যেই এটাকে আমি নিখুঁত দেখতে চাইব। এটা তোমাকে আবার টাইপ করতে হবে।'

'ভুল করেছি? কোথায়?' চ্যালেঞ্জ করে বসল লিলি।

শাহিন মুখ তুলে তাকাল না, বলল, 'আমি আণ্ডারলাইন করছি।' ভুলগুলোর নিচে দাগ দেয়ার সময় বলল, 'অনারেবল-এর আগে এ হবে না, হবে অ্যান। কোজি বানানে এস থাকবে না, থাকবে জেড, কারণ এল/সিটা যাচ্ছে আমেরিকায়, ব্রিটেনে নয়। এ-ধরনের ছোটখাট ভুল আর কি, তবে শুদ্ধ হওয়া দরকার।'

লজ্জায় চোখমুখ লাল হয়ে উঠল লিলির। কথা না বলে কপিটা ফেরত নিয়ে আবার টাইপ করতে বসল। দ্বিতীয়বার টাইপ করা শেষ হতে ওর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়লও না শাহিন, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে শুধু বলল, 'ধন্যবাদ।'

উত্তর না দিয়ে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এল লিলি।

ব্যাপারটা অনেক দিন, তা প্রায় মাসখানেক ধরে লক্ষ করছে রায়হান চৌধুরী। লিলির এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও, নাক গলাবার তার অধিকার আছে বলে মনে করছে সে। তাছাড়া, লিলিকে নিয়ে তার নিজেরও কিছু চিন্তা-ভাবনা আছে। মেয়েটিকে তার অসম্ভব ভাল লাগে, যদিও সে বিবাহিত হওয়ায় এই ভাল লাগার কোন বিশেষ অর্থ নেই। তবু,

ওকে নিয়ে চিন্তা না করে পারে না সে, কারণ আমেরিকা থেকে যে-সব চিঠিপত্র আসছে তাতে মনে হয় না যে বিয়েটা তাদের শেষ পর্যন্ত টিকবে।

এটা ছাড়া উদ্বিগ্ন হবার অন্য কারণও আছে রায়হান চৌধুরীর। বিশেষ করে আসিফ ইকবাল সম্পর্কে যে-সব তথ্য সে পেয়েছে, কোনটাই স্বস্তিকর নয়। কাজেই মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিল সে, প্রসঙ্গটা আজ এক সময় তুলবে।

বিকেলের দিকে সুযোগ পাওয়া গেল। লিলিকে ডেকে দু'কাপ কফি চাইল সে। 'পিয়নকে বলে ফিরে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ফিরে এসে বসল লিলি। ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রায়হান চৌধুরী। একটু বিস্মিত হলো লিলি। এভাবে তো কখনও তাকায় না বস্। একটু লজ্জামত পেল, জানে এভাবে তাকিয়ে থাকার কারণ হলো ওর মেকআপ। আজকাল মনের আনন্দে একটু বেশিই সাজগোজ করে ও।

'আজও তোমরা বোধহয় কোথাও বেড়াতে যাবে, তাই না?' হালকা সুরে জানতে চাইল রায়হান চৌধুরী।

'জ্বী। ও আজ আমাকে গ্রিল হাউসে খেতে নিয়ে যাবে।'

'ও মানে বোধহয় ইকবাল সাহেব, নাকি আমি বুঝতে ভুল করছি?'

'বুঝতে···না, হ্যাঁ, ইকবাল। কেন বলুন তো?'

'তুমি ওকে কতদিন থেকে চেনো, লিলি?'

অবাক হয়ে তাকাল লিলি। 'রায়হান ভাই, কি ব্যাপার বলুন তো? আপনি হঠাৎ আজ আমাকে এ-সব প্রশ্ন···?'

'এক দেড়মাস, তাই না?' লিলিকে বাধা দিয়ে বলল রায়হান। 'কিন্তু ভেবে দেখছ কি, একজন মানুষকে চিনতে এই অল্প সময় যথেষ্ট কিনা?'

তাকিয়ে থাকল লিলি, সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না। তারপর জানতে চাইল, 'আপনি ওর সম্পর্কে কিছু শুনেছেন?'

'সে-সব কথা পরে আলোচনা করব,' বলল রায়হান। 'তার আগে আমাকে জানতে হবে, তোমাদের সম্পর্কটা আসলে কতটুকু গভীর।'

লিলির চোখে পলক পড়ছে না, দৃষ্টিতেও আশ্চর্য স্থির একটা ভাব। 'যতটুকু গভীর হওয়া সম্ভব, রায়হান ভাই, যার চেয়ে গভীর আর হতে পারে না। আপনাকে কালই আমাদের জানাবার কথা—আমরা মানে মা। আগামী শুক্রবার পাকা কথা হবে। মার ইচ্ছে আপনিও আমার একজন অভিভাবক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।'

'হোয়াট!' প্রায় আঁতকে উঠল রায়হান। 'কি বলছ! ইকবাল সাহেবের সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তার সম্পর্কে কি জানো তোমরা? খোঁজখবর নিয়েছ? আসলে কি করে সে, কোথায় থাকে, বংশ পরিচয়, কারা তার আত্মীয়স্বজন?'

লিলি বলল, 'ঢাকা, সিলেট আর চাটগাঁতে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে, খুলনা থেকে চিংড়ি রফতানি করে...'

'এ-সব আমিও শুনেছি। কিন্তু কার মুখে? সত্যি কিনা যাচাই করে দেখেছ?'

হেসে ফেলল লিলি। 'আপনি শুধু শুধু চিন্তা করছেন। ওকে দেখলেই তো বোঝা যায়, অত্যন্ত অভিজাত বংশের ছেলে। মার তো সাংঘাতিক পছন্দ। প্রস্তাবটাও মার। আর খোঁজখবর নেয়ার কথা বলছেন, আপনি আছেন কি করতে? ওর সবগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা আর ফোন নম্বর আপনার কাছে তো আছেই, নিন না খোঁজ।'

'খোঁজ তো অবশ্যই নেব, বিশেষ করে সন্দেহ যখন হয়েছে। কথা

হচ্ছে, ফোন করে কি আর আসল খবর পাওয়া সম্ভব?'

'সন্দেহ হয়েছে মানে?'

পিয়ন কফি নিয়ে এল, সে চলে যাবার পর রায়হান বলল, 'নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, গত এক মাসে তিন-চারটে গাড়ি বদল করেছে সে?'

আবার হেসে ফেলল লিলি। 'ও, এই কথা। আসলে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি কেনে তো, প্রতিবারই ঠকে—কোন না কোন ট্রাবল দেবেই। কাজেই একটা বিক্রি করে আরেকটা কেনে।'

'না, লিলি। গাড়িগুলো সে কেনে না। গ্যারেজ থেকে ভাড়া করে আনে।'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল লিলি, রায়হান ওকে বাধা দিয়ে আবার বলল, 'শুধু তাই নয়, লণ্ড্রী থেকে ড্রেস পর্যন্ত ভাড়া করে সে। কেউ একজন নিজের চোখে দেখেছে। আমি তার নাম বলতে চাই না, শুধু জেনে রাখো সে চায় না তুমি কোন বিপদের মধ্যে পড়ো।'

লিলি বলল, এমন হালকা সুরে, রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেল রায়হান চৌধুরী। 'এসব কি প্রমাণ করা সম্ভব—আপনার পক্ষে বা আমার নাম-না-জানা শুভানুধ্যায়ীর পক্ষে?'

'এখানেই শেষ নয়, লিলি। আরও আছে। আমি শুনেছি তার নামও নাকি আসিফ ইকবাল নয়। আরও শুনেছি, ঢাকায় তার এমন সব বন্ধু আছে যারা ড্রাগ অ্যাডিক্টস, ধনী বা প্রভাবশালী লোকের ছেলে, তারা এমনকি ছিনতাই বা ওই ধরনের অপরাধের সঙ্গেও জড়িত। ছিনতাইকারীদের কাছ থেকে তোমার মার নেকলেসটা উদ্ধার করে দিয়েছিল ইকবাল, তোমার মুখে শুনেছি বটে, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে সাজানো বলে মনে হয়েছে।'

এতকিছু বলার পরও লিলি কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না। বলল, 'ঠিক

আছে, ইকবালকে গাড়ির ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করব। তবে, রায়হান ভাই, আপনার বাকি প্রশ্নের উত্তর এখুনি আমি দিতে পারি।'

'যেমন?'

'ও-ই আমাকে জানিয়েছে, সার্টিফিকেটে ওর নাম ফিউরি খন্দকার হলেও, বাবার দেয়া নাম ইকবাল আর মায়ের দেয়া নাম জাহিদ—অনেকটা কৌতুক করার খেয়ালেই তিনটে নামই ব্যবহার করে ও। সব মানুষ কি সমান হয়, বলুন? এ-ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে আনন্দ পায় ও, কি করা যাবে। নিজে থেকেই একদিন একটা ঘটনার কথা বলল, বোধহয় এই ঘটনাটাই কেউ দেখেছে, দেখে ভুল বুঝেছে ওকে।'

'কি সেটা?'

কফির কাপে চুমুক দিল লিলি, মিটি মিটি হাসছে। 'ধানমণ্ডির কাছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়, খুব মারাত্মকভাবে আহত হয় এক ছেলে। অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল একটা প্রাইভেট কার। গাড়ির মালিকের কাছ থেকে আট হাজার টাকা আদায় করা হয়, ছেলেটার চিকিৎসার জন্যে। একটা টেম্পো করে তাকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কয়েকজন ছেলের সঙ্গে ইকবালও উঠেছে তাতে। কিছুদূর যাবার পর ইকবাল বুঝতে পারে, গোটা ব্যাপারটা আসলে অভিনয়। ছেলেটা আহত হয়নি, রক্তটা আসলে রঙ। যে ছেলেগুলো টেম্পোতে ছিল তাদের কথাবার্তা আর হাবভাবে ভয় পেয়ে যায় ও, টেম্পো থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে···।'

'এই ঘটনার কথা ইকবাল নিজে থেকে তোমাকে বলেছে? তুমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করোনি?'

মাথা নাড়ল লিলি। 'আরও একটু বলি, তাহলে বুঝবেন ওকে সন্দেহ করার কিছুই নেই। লণ্ড্রী থেকে কাপড় নেয় ও, কিন্তু ভাড়া করে বললে ভুল

হবে। ওর কাপড় ডেলিভারি দিতে না পারলে কর্মচারীরাই ওকে অন্য কাপড় ধরিয়ে দিয়ে কাজ চালাতে অনুরোধ করে।'

'দেখা যাচ্ছে সম্ভাব্য যে-সব প্রশ্ন তোলা হতে পারে, তার বেশিরভাগেরই উত্তর আগেভাগে দিয়ে রেখেছে সে,' বলল রায়হান চৌধুরী। 'কিন্তু এ-সব উত্তরে আমি সন্তুষ্ট নই, লিলি। এতদিন হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত তাকে দিয়ে একটা এল/সি খোলাতে পারলাম না। চিন্তা করতে পারো, আমার মত লোক তার কাছে হেরে যাচ্ছে? দরে বনে তো কমিশনে বনে না, কমিশনে বনে তো শিপমেন্টের তারিখ পছন্দ হয় না, একটা না একটা অজুহাতে শুধু পিছিয়ে যাচ্ছে। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে, ঢাকায় বা অন্য কোথাও কোন ব্যবসাই তার নেই, সব মিথ্যে।'

আঙুল দিয়ে ডেস্কের ওপর তবলা বাজাল লিলি। 'মা এ-সব শুনলে নির্ঘাৎ হার্টফেল করবে। শুনুন, এতসব কথা ভাবছেন আপনি আমার ভাল চান বলে, ঠিক?' মাথা দোলাল রায়হান। 'তাহলে এখুনি যাচাই করুন, কারণ মনে সন্দেহ পুষে রাখা ঠিক না। ওর গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে ফোন করুন—ঢাকায়, চাটগাঁতেও। জিজ্ঞেস করুন, কে মালিক? ইকবাল, জাহিদ বা ফিউরি খন্দকারকে তারা চেনে কিনা।'

শিরদাঁড়া খাড়া করল রায়হান চৌধুরী। 'মন্দ বলোনি,' বলে ফোনের রিসিভার তুলল সে।

'তারপর কি হলো?' জানতে চাইল ফিউরি। 'রায়হান সাহেব সত্যি সত্যি ফোন করলেন?'

বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে এসেছে ওরা, গাছপালায় ঘেরা বড় একটা পুকুরের কিনারা ঘেঁষে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। হেসে উঠে লিলি বলল, 'করলেন মানে—চাটগাঁ আর সিলেটে, দু'জায়গাতেই। তার আগে

তোমার ঢাকার অফিসে।'

ওখানে স্বপন আছে, ফিউরির এক শিষ্যই বলা যায় তাকে। সালমা গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরির মালিক স্বপন নয়, তার ভগ্নীপতি—ভগ্নীপতির নাম জাহিদ হোসেন আর তাঁর মায়ের নাম সালমা বেগম। ভদ্রলোকের আরও অনেক ব্যবসা আছে, নতুন এই ব্যবসাটা এখনও তেমন লাভের মুখ দেখছে না বলে নিজে বসেন না। ম্যানেজারের চাকরিটা পাবার আগে স্বপন একটা গ্রুপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, গ্রুপটার কাজই ছিল মানুষ ঠকানো, ঢাকায় এলে তাদের সঙ্গে ভিড়ে যেত ফিউরি। গলায় গলায় ভাব দু'জনের। এরকম ফোন কল যে আসতে পারে, স্বপনকে আগেই জানিয়ে রেখেছে ফিউরি।

'ঢাকা অফিস থেকে বলা হলো, ফ্যাক্টরির নাম রাখা হয়েছে জাহিদ হোসেনের মার নামে। বলা হলো, জাহিদ হোসেনের আরও ফ্যাক্টরি আছে সিলেটে আর চাটগাঁয়। এরপর ওই দু'জায়গায় ফোন করলেন রায়হান ভাই। দু'জায়গা থেকেই জানা গেল তুমিই ওগুলোর মালিক।'

হাসল ফিউরি। 'উফ, রায়হান সাহেব দেখছি সাংঘাতিক মানুষ! আমাকে একফোঁটা বিশ্বাস করেন না।'

বসের পক্ষ নিল লিলি। 'আসলে তা না। উনি সত্যি আমার ভাল চান। আসলে দায়ী কে জানো? সেই ছেলেটা, যার কথা সেদিন তোমাকে আমি বলছিলাম—শাহিন সিদ্দিকী। রায়হান ভাইয়ের মনে এ-সব সন্দেহ সে-ই ঢুকিয়েছে।'

'আহা বেচারা! আমি বলব, ওর প্রতি তুমি অবিচার করেছ। এতগুলো বছর তোমার পিছনে লেগে আছে, অন্তত নিষ্ঠার প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে। লিলি, ওর অপরাধ তুমি ক্ষমা করে দিলেই তো পারো।'

'ধ্যেত, কি ক্ষমা করব, ও কোন অপরাধ করলে তো! আমার ভুল তো

অনেক আগেই ভেঙেছে, জানি স্কুলে পড়ার সময় যা ঘটেছিল তাতে ওর ভূমিকা ছিল আমাকে রক্ষা করা। জানো, চুপিচুপি আরও অনেক সাহায্য করেছে আমাকে সে। ইন্টারমিডিয়েটে আমার রেজাল্ট ভাল হয়নি, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন একটা ছাত্র সংগঠনের নেতা ফোন করে আমাকে বলল, সে নিজে সুপারিশ করায় আমার ভর্তি হবার পথে আর কোন বাধা নেই। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আমার জন্যে সুপারিশ করেছিল শাহিন। এরকম আরও বহু ঘটনার কথা জানি আমি, কিন্তু সাহায্য করেছে আমাকে না জানিয়ে।'

'নিশ্চয়ই তোমাকে সাংঘাতিক ভালবাসে।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল লিলির। বলল, 'বাদ দাও তো!'

'রায়হান সাহেব কিন্তু তাঁর সন্দেহের কথা আমাকে কিছুই বলেননি,' বলল ফিউরি। 'কালই তো দেখা হলো, জানতে চাইলেন বিয়ের পর তোমাকে নিয়ে কোথায় উঠব, আমি বললাম, ভাল এলাকায় একটা বাড়ি খুঁজছি।'

'উনি মাকে বলেছেন, তাঁর উত্তরার বাড়িটায় তিন তলার একটা ফ্ল্যাট খালি আছে, ইচ্ছে করলে ওটা তুমি ভাড়া নিতে পারো।'

'আমাকেও বলেছেন। আমি বলেছি, মন্দ হয় না।'

'ভালই হয়,' বলল লিলি। 'পরিচিত মানুষের কাছে থাকলাম। শুনলাম ফ্ল্যাটটায় ফোনও আছে—যখন ইচ্ছা মার সঙ্গে কথা বলতে পারব। ভাল কথা, উনি তোমাকে গাড়ির কথা কিছু জিজ্ঞেস করেননি?'

হেসে উঠল ফিউরি। 'হ্যাঁ, একটু ঘুরিয়ে। বললেন, উনি শুনেছেন আমি নাকি কোন গ্যারেজ থেকে প্রায়ই গাড়ি ভাড়া করে আনি।'

ফিউরির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লিলি। 'তুমি কি বললে?'

'সত্যি কথাই বললাম,' এখনও হাসছে ফিউরি। 'বললাম, আমি চাই

না, ওরা নিজেরাই একটা করে গছিয়ে দেয়।'

'মানে··· কিন্তু কেন?'

'সাধারণত কি হয় বলি। আমার গাড়ি মেরামত বা সার্ভিসিং করতে দিয়েছি, নির্দিষ্ট দিনে ডেলিভারি আনতে গেলাম, কিন্তু দেখা গেল কাজ শেষ হয়নি—আমি যাতে রাগ না করি, অন্য কারও একটা গাড়ির চাবি ধরিয়ে দিয়ে বলে, আপাতত কাজ চালান, কাল বা পরশুর মধ্যে আপনার গাড়ি পেয়ে যাবেন।'

আটকে রাখা দম ছেড়ে হেসে উঠল লিলি। 'শুনে কি বললেন রায়হান ভাই?'

'কি আর বলবেন। স্বীকার করলেন, মেকানিকরা তাঁকেও এরকম দু'একবার অন্য লোকের গাড়ি সেধেছে।'

তোমাকে আমি ভালবাসি, মনে মনে ভাবল লিলি। তোমাকে দেখার আগে আমি জানতামও না যে আমার ভেতর এত ভালবাসা জমা হয়ে আছে। মনের গভীর থেকে একটা প্রশ্ন উঠে এল, আগেও যেমন এসেছে, কিন্তু তোর প্রতিজ্ঞার কি হবে? তুই না বলেছিলি, ব্যবসা করে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াবি, তার আগে পর্যন্ত বিয়ে বা ভালবাসার কথা ভাববি না? উত্তরটাও তৈরি করা আছে লিলির মনের আরেক অংশে, প্রেম করার জন্যে ভবিষ্যতে হয়তো আরও অনেক ছেলে পাওয়া যাবে, কিন্তু ফিউরিকে তো আর পাওয়া যাবে না। ও আমাকে জাদু করেছে, কাজেই আমি অসহায়। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে বিয়ে একটা বাধা, তাই-ই বা কে বলল? একটা মেয়ের জীবনে প্রেম যদি না থাকে তো তার কিছুই নেই। আজ যখন আমি সেটা পেয়েছি, হারাব কেন?

লিলি বলল, 'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম বিয়ের প্রস্তাবটা তোমার কাছ থেকেই আসবে। মাকে আমি ক'দিন অপেক্ষা করতেও বলেছিলাম, কিন্তু

তোমাকে মার এত ভাল লেগে গেছে যে অপেক্ষা করতে রাজি হলো না।'

'এখানে একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটে গেছে বলে মনে হয়,' লিলির হাত ধরে একটা বেঞ্চের দিকে এগোল ফিউরি। 'প্রস্তাবটা আসলে আমিই আম্মুকে দিয়েছি, তবে আভাসে। সেই আভাস পেয়েই আম্মু···।'

'কি রকম?'

'বলেছিলাম, আমি যদি আমার আম্মুকে আরও আপন করে পেতে চাই, তা কি সম্ভব? কি বলতে চেয়েছি উনি তা ঠিকই ধরে ফেলেন।'

'আশ্চর্য, মা তো আমাকে কথাটা বলেনি!' লিলির গলায় অভিমান প্রকাশ পেলেও, মনে মনে গর্ব অনুভব করল। ষোলো আনা নিশ্চিত হওয়া গেল, ব্যাপারটা একতরফা নয়—ফিউরিও ওকে ভালবাসে। 'তুমি বলেছ, বিয়ের কিছুদিন পর সিলেট বা চাটগাঁয় চলে যাব আমরা। কিন্তু আমার ইচ্ছে ঢাকায় থাকি। যদিও আমার এক বিধবা খালা মার কাছে থাকবে বলে এসেছে, কিন্তু আমি ঢাকায় না থাকলে মার খুব একা লাগবে।'

'এ-সব ব্যাপার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও, লিলি,' বলল ফিউরি। 'খুব বেশি হলে তিন থেকে ছ'মাস আমরা এখানে সেখানে থাকব, তারপর যেখানেই সংসার পাতি, আম্মু আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এ-কথা আমি কোনদিন ভুলব না যে আম্মুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল বলেই তোমাকে আমি পেয়েছি।'

বেঞ্চে বসে ফিউরির কাঁধে মাথা রাখল লিলি। 'আমাকে তোমার ছেলেবেলার গল্প শোনাও। তোমার সব কথা আমি শুনতে চাই। একেবারে প্রথম থেকে শুরু করো, যে-সব কথা তোমার মনে পড়ে।'

রেগে গেল শাহিন। বলল, 'রেহান ভাই, তুমি দেখছি প্রতারকটার পক্ষে কথা বলছ।'

রাত এগারোটার মত বাজে, নিজের অফিসে বসে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে রায়হান চৌধুরী। ঘণ্টাখানেক আগে শাহিনের বাড়িতে টেলিফোন করেছিল সে, মিনিট দশেক আগে পৌঁচেছে শাহিন, এসে দেখে এই অবস্থা। রায়হান চৌধুরীর মদ্যপান সম্পর্কে সে কোন প্রশ্ন তোলেনি, আসলে তোলার সুযোগ পায়নি এখনও। ঢোকার পরই তার রেহান ভাই ইকবাল সম্পর্কে সাফাই গাইতে শুরু করে।

'পক্ষে না বলে কি করব, তুই-ই বল?' জানতে চাইল রায়হান চৌধুরী। মদ সে অনেকক্ষণ ধরেই খাচ্ছে, তবে মদের চেয়ে কোকের পরিমাণ বেশি বলে, খাচ্ছেও অল্প অল্প করে, এখনও জোরাল নেশা হয়নি তার। তাছাড়া, মদ খাওয়াটা তার অভ্যাসও হয়ে গেছে। রোজই খায়, তবে গোপনে। 'তোর সমস্ত তথ্য ভুল, শাহিন। প্রতিটি ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছে সে। আমি তার সিলেট আর চট্টগ্রাম অফিসেও ফোন করেছিলাম, জেনেছি ওখানকার ফ্যাক্টরিগুলোর মালিকও সে।'

'সে মানে কে? তার নাম কি?'

'আগেই জেনেছি, লিলির মুখে, সার্টিফিকেটে তার নাম ফিউরি খন্দকার হলেও···।'

ফিউরি খন্দকার! নামটা শোনামাত্র শাহিনের মাথার ভেতর বেল বেজে উঠল। হ্যাঁ, এবার তার মনে পড়েছে। এই নামেই ওকে চেনে সে, প্রথম কোথায় দেখেছে তা-ও ঝট করে মনে পড়ে গেল। চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে···ঢাকা থেকে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল শাহিন, তাদের পাল্লায় পড়ে অনুষ্ঠানটা দেখতে হয়েছিল। পরিষ্কার মনে করতে পারল, ফিউরি খন্দকার একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিল সেখানে···।

'বিয়ের আর মাত্র তিনদিন বাকি, আমার পক্ষে তো আর সিলেট বা চট্টগ্রামে গিয়ে খোঁজ নেয়া সম্ভব নয়, কাজেই ফোনে যা জেনেছি তাই মেনে নিতে হবে···।'

'লিলি কি বলছে? ফিউরি সম্পর্কে এ-সব কথা শুনে তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই?'

'নেই। তার ধারণা, ফিউরি দেবতা। তার আরও ধারণা, এ-সব আজেবাজে কথা তুই-ই রটাচ্ছিস।'

চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল শাহিন। 'আমি তাহলে যাই, রেহান ভাই।'

'কি আশ্চর্য, তোর সঙ্গে কোন কথাই তো হলো না। কেন ডেকেছি না শুনেই চলে যাবি?'

'কেন ডেকেছ?' শাহিন বসল না। হাতঘড়ি দেখল সে। 'আমার কাজ আছে, এক জায়গায় যেতে হবে। কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো।'

'একবারও জানতে চাইলি না আমি মদ খাচ্ছি কেন···।'

বসল শাহিন। 'কেন খাচ্ছ?'

পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে শাহিনের দিকে বাড়িয়ে ধরল রায়হান চৌধুরী। 'এটা পড়, তাহলেই বুঝতে পারবি।'

চিঠিটা নিঃশব্দে পড়ল শাহিন। আমেরিকা থেকে নার্গিসের উকিল লিখেছে। জানতে চাওয়া হয়েছে, নার্গিসের নামে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও উত্তরার বাড়ি থেকে রায়হান চৌধুরীকে কেন বহিষ্কার করা হবে না।

'বাড়ি আর ব্যবসা, দুটোই ভাবীর নামে?' জিজ্ঞেস করল শাহিন।

'হ্যাঁ। আমি শুধু ম্যানেজিং পার্টনার।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শাহিন বলল, 'নেশা করে সমস্যার

সমাধান করতে পারবে?'

'তার আগে বল, এই সমস্যার সমাধান আদৌ আছে কি?'

'আছে, আমার দৃষ্টিতে সেটা সুন্দর বলেও মনে হয়,' বলল শাহিন। 'ভাবীর দাবি তুমি মেনে নাও। ডিভোর্স করো তাঁকে। এর আগের চিঠিতে তিনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন, সবদিক থেকে দু'জনের জন্যে সেটাই ভাল। ডিভোর্স করো, উত্তরার বাড়ি ফিরিয়ে দাও, ব্যবসাটা তোমার থাকুক।'

'ওহ্ গড! শাহিন, তুই আমার প্রেস্টিজের কথা একবারও ভাবছিস না। নার্গিসকে ডিভোর্স করলে সমাজে মুখ দেখাব কি করে? লোকে হাসবে না?'

'লোকে আরও বেশি হাসবে, নার্গিস ভাবী যদি বাড়ি আর ব্যবসা দুটোই কেড়ে নেন।' আবার হাতঘড়ি দেখল শাহিন। 'আমি যাই, রেহান ভাই। খুব জরুরী একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেছে।'

পাঁচ

খাট, সোফা সেট, ডিনার ও ড্রেসিং টেবিল, সবই খুব দামী; লাবণী আহমেদ বারণ করা সত্ত্বেও এ-সব কিনেছে ফিউরি। তিনি তো আর জানেন না যে এগুলোর একটাও আসলে কেনা হয়নি, ভাড়া করে আনা হয়েছে। উত্তরার এই ফ্ল্যাটটায় বেডরুম দুটো, ফলে অতিরিক্ত ফার্নিচার

রাখতে কোন অসুবিধে হলো না। লাবণী আহমেদ তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়েতে সামর্থ্য মত সবকিছুই দিয়েছেন—সমস্ত ফার্নিচার, রঙিন টিভি, এমনকি কার্পেট পর্যন্ত বাদ যায়নি। গহনা দেয়া হয়েছে প্রায় ত্রিশ ভরি। লিলিকে এক সেট গহনা ফিউরিও দিচ্ছে—অর্ডার দেয়া হয়েছে, জুয়েলারির দোকান থেকে আজই ডেলিভারি পাওয়া যাবে।

বিয়ে পড়ানোর ঝামেলাটা সকালেই সেরে ফেলা হলো। সন্ধ্যার পর একটা চাইনীজ রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া। খুব বেশি লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়নি, সব মিলিয়ে বিশ-বাইশজন। কাকাদের কাউকে দাওয়াত দেয়া যাবে না, মেয়ের এই জেদের কাছে হার মেনেছেন লাবণী আহমেদ। লিলি শুধু ওর তিনজন বান্ধবীকে দাওয়াত দিয়েছে, তবে অফিসের কাউকে বাদ দেয়নি। একটা কার্ড আলাদা করে রেখেছিল ও, এনভেলাপে নামও লিখেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্ডটা ঠিকানা মত পাঠানো হয়নি। পাঠানো হয়নি, কারণ শাহিন সিদ্দিকীর ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারেনি ও। ওর ধারণা ছিল রায়হান চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে। কিন্তু রায়হান ভাই এড়িয়ে গেছেন, বলেছেন সে বোধহয় ঢাকায় নেই। বিয়েতে দাওয়াত দেয়া হলো না, মনটা খারাপ হয়ে আছে লিলির। এতগুলো বছর ধরে ছেলেটা তার উপকার করে আসছে, তার জীবনের সবচেয়ে খুশির দিনে সে উপস্থিত থাকবে না, ভাবতে ভাল লাগেনি। পরে অবশ্য আবার এ-কথাও ভেবেছে, দাওয়াত দেয়া হয়নি ভালই হয়েছে। মনে হয়েছে, অন্তত এই ছেলেটাকে দাওয়াত দেয়ার মধ্যে কোথায় যেন একটা নিষ্ঠুরতা আছে। ভালই হয়েছে পাওয়া যায়নি ঠিকানাটা।

যদিও খুঁতখুঁতে ভাবটা তাতে দূর হয়নি। বোধহয় সেজন্যেই রেস্তোরাঁয় খেতে বসে এক ফাঁকে রায়হান চৌধুরীকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছে লিলি, 'আপনার শাহিন সিদ্দিকীর কোন খোঁজ পেলেন?'

মুখে কিছু না বলে নিঃশব্দে শুধু মাথা নেড়েছে রায়হান।

খাওয়াদাওয়া শুরু হবার আগে ফিউরির এক বন্ধু এল, হাতে কালো ব্রিফকেস। লিলির কানে কানে ফিউরি বলল, 'তোমার গহনা এসে গেছে। আম্মুর দেয়া ওগুলো খুলে তুমি আমার দেয়া সেটটা পরলে খুশি হই।'

হেসে উঠল নতুন বউ। 'এখানে? না-না, বাড়ি চলো, তুমি আমাকে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়ো।'

'তাহলে ব্রিফকেসটা বাকি সব প্রেজেন্টেশনের সঙ্গে রাখতে বলি?'

'বলো।'

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে রাত দশটা বেজে গেল। লিলির সঙ্গে ওর এক খালাতো বোন যাচ্ছে, ফ্ল্যাটে বেডরুম দুটো থাকায় থাকার কোন অসুবিধে হবে না। কাজের একটা বুয়াও থাকবে। ফিউরির গাড়ি তো আছেই, জিনিস-পত্র নেয়ার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে রায়হান চৌধুরীর গাড়িটা। একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে, লাবণী আহমেদ তাঁর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বাড়ি ফিরবেন।

বিদায় নেয়ার সময় একটুও কাঁদল না লিলি। নিজের হাতে মায়ের চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'বাড়িতে ঢুকেই তোমাকে আমি ফোন করব। তখনও যদি তুমি কাঁদো, আমি কিন্তু ফিরে আসব বাড়িতে।' ওর এই কথা শুনে যিনি নিয়তি লেখেন তিনি সম্ভবত সন্তুষ্টচিত্তে সমর্থনসূচক হাসি হাসলেন আপনমনে।

ঘর-দোর আগেই সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে, শুধু সদ্য আনা জিনিস-পত্রগুলো যত্ন করে তুলে রাখা হলো। দোতলার চাকরবাকর অর্থাৎ রায়হান চৌধুরীর লোকেরা, এমনকি সে নিজেও, ছুটোছুটি করে সাহায্য করল ওদেরকে। তারপর এক সময় একা হবার সুযোগ পেল দু'জন।

লিলির খালাতো বোন তার ঘরে ঢুকে বন্ধ করল দরজা। কাজের বুয়াও রান্নাঘরে শুয়ে পড়েছে। নিজেদের বেডরুমে, বিছানার ওপর বসে, ব্রিফকেসটা খুলল ফিউরি। শাশুড়ির দেয়া গহনাগুলো গা থেকে এক এক করে খুলে নিয়ে নিজের দেয়া গহনাগুলো লিলিকে পরিয়ে দিল নিজের হাতে। ইমিটেশন হলেও খুব দামী, নকল বলে চেনার উপায় নেই। স্বামীর দেয়া গহনা পরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হলো লিলি, ফিউরিই তার হাত ধরে টেনে আনল। 'দেখো, তোমাকে ঠিক রানীর মত লাগছে।'

আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে লিলি বলল, 'রাজা পাশে আছে বলেই আজ ও রানী।'

টেলিফোনটা বেজে উঠল লিলি বাথরুমে ঢোকার পর। বাথরুম থেকে প্রায় মিনিট দশেক পর বেরিয়ে কামরায় ফিউরিকে দেখল না ও। মুচকি হেসে উঁকি দিল ঝুল-বারান্দায়। নেই দেখে ভাবল, ড্রইংরুমে আছে। দরজা খুলে অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। 'ফিউরি?' ডাকল লিলি। কোন সাড়া নেই। দেয়াল হাতড়ে সুইচবোর্ড খুঁজল। আবার ডাকল, 'ফিউরি?' আলো জ্বলল, কিন্তু ড্রইংরুমেও নেই সে।

প্যাসেজেও কেউ নেই। দ্বিতীয় বেডরুম আর কিচেনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দ্বিতীয় বাথরুমের দরজা খোলা, ভেতরে কেউ নেই।

'ফিউরি!' লিলি ভাবল, বাথরুমে থাকার সময় একটা শব্দ শুনেছিল ও, মনে হয়েছিল টেলিফোন বাজছে। ফিরে এসে দেখল ক্রেডলে যেমন থাকার কথা তেমনি রয়েছে রিসিভার। 'ফিউরি!' দ্রুতপায়ে আবার প্যাসেজে বেরিয়ে এল। দেখল, ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাবার দরজাটা খোলা। উঁকি দিয়ে তাকাল ও। সিঁড়িতে আলো জ্বলছে। কিন্তু ফিউরি নেই।

একবার ভাবল, রায়হান ভাই ফোন করে ওকে ডাকেনি তো? কিন্তু না, অসম্ভব। তিনি এমন বেরসিক নন যে ফুলশয্যার রাতে বিরক্ত করবেন ওদেরকে। তাহলে?

দরজা খোলা, তারমানে ফিউরি বেরিয়ে গেছে। কোথায় যেতে পারে সে? চৌকাঠ টপকে ল্যাণ্ডিঙে বেরিয়ে এল লিলি। ফিসফিস করে ডাকল, 'ফিউরি, তুমি কোথায়?'

কোন সাড়া নেই।

নতুন বউ, ফ্ল্যাট ছেড়ে এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। কেউ দেখে ফেললে ভাববে কি! তবু দাঁড়িয়েই থাকল লিলি। তার বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। তারপর হঠাৎ খেয়াল হলো, বাথরুমে ঢোকার আগে শেষবার ফিউরিকে দেখেছে স্টীল আলমারি খুলে ওর মার দেয়া গহনাগুলো তুলে রাখছে।

দরজা খোলা রেখেই বেডরুমে ফিরে এল লিলি। বিছানায় বসে চিন্তা করছে। কোথায় যেতে পারে সে? আবার একবার ঘুরে এল সিঁড়ি থেকে। ফিউরির নাম ধরে ডাকাডাকিও করল বার দুয়েক। ইতিমধ্যে প্রায় আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। কি করবে বুঝতে পারছে না লিলি। রায়হান ভাইকে ডাকবে? ওর খালাতো বোন নিপার ঘুম ভাঙাবে? নাকি টেলিফোন করবে মাকে?

বেডরুমে ফিরে এল লিলি। স্টীল আলমারির দিকে তাকাল। তালার সঙ্গে চাবিটা ঝুলছে। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও পা পা করে এগোল সেদিকে। চাবি ঘুরিয়ে কবাট খুলল। ঠিক সচেতনভাবে নয়, অনেকটা যেন নেশার ঘোরে অপ্রীতিকর একটা কাজ করছে ও। নতুন আলমারি, ভেতরে তেমন কিছুই নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু কয়েক থাক শাড়ি। শাড়িই আছে, গহনাগুলো নেই।

এলোমেলো পা ফেলে কোন রকমে হেঁটে এল বিছানার কাছে। তারপরই ঘুরে উঠল মাথাটা। খাটের স্ট্যাণ্ড ধরে সামলে নিল নিজেকে, ধপাস করে বসে পড়ল। সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। 'ফিউরি,' আতঙ্কে প্রায় বুজে আছে গলা, 'না!'

বন-জঙ্গলে ঘেরা নির্জন এলাকা, গা ছমছম করতে লাগল লিলির। এক হাতে ড্রাইভ করছে রায়হান চৌধুরী, অপর হাতটা দিয়ে চারদিক দেখিয়ে বলল, 'গোটা এলাকাই তুহিনদের। বাপ-দাদার রেখে যাওয়া সম্পত্তি, চোদ্দপুরুষ বসে খেলেও ফুরোবার নয়। সব মিলিয়ে কয়েকশো একর তো হবেই।'

সামনে একটা মাটির টিলা দেখা গেল, আকারে বেশ বড়, সবুজ গাছপালায় এমন ঢাকা যে মাথার ওপর কিছু থাকলেও দেখার উপায় নেই। পিছনের সীট থেকে লাবণী আহমেদ বললেন, 'তোমার বন্ধু তো বলছ দেশে নেই, ওর মা-ভাইরা বিব্রত বোধ করবেন না তো? এখানে আমাদের ক'দিন থাকতে হয় কে জানে।'

'পৌঁছুলেই বুঝতে পারবেন কেমন মানুষ তাঁরা,' হেসে উঠে বলল রায়হান। 'আমাকে ওঁরা সেই ছোটবেলা থেকে চেনেন। তুহিন নেই তো কি হয়েছে, ওরা আমাকে তুহিনের চেয়ে কম ভালবাসেন না। ফোনে আলাপ করেছি—খালাম্মা, তুহিনের আম্মা, অত্যন্ত খুশি মনে রাজি হয়েছেন, বলেছেন যতদিন খুশি থাকতে পারব আমরা।'

'লিলির সমস্যাটার কথা কি বলেছ ওদের?'

'তা-ও বলেছি। তুহিনের ভাই-ভাবীরা বলেছেন, প্রয়োজনে তাঁরাও সাহায্য করবেন।'

ইঁট বিছানো রাস্তা, মনে হলো ওপর দিকে উঠে গেছে। পিছন থেকে

লিলি জিজ্ঞেস করতে রায়হান বলল, 'হ্যাঁ, চারপাশে গাছপালা রয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে না, আমরা আসলে টিলা পেঁচিয়ে থাকা রাস্তা বেয়ে ওপরে উঠছি। ওদের বাড়িটা টিলার মাথায়।'

টিলার ওপর ওঠার পর সবুজ মাঠ দেখা গেল। সামনে একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি, বেশ বড়ই বলা যায়, উঁচু উঁচু গাছ দিয়ে ঘেরা। বাড়ির সামনে বেশ ক'জন মানুষ দেখা গেল। বেশিরভাগই মহিলা। রায়হান বলল, 'ওঁরা আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।'

গাড়ি থামল, দরজা খুলে বেরিয়ে এল ওরা তিনজন।

লিলি দেখল, ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো সবাই হাসছে। বৃদ্ধা এক মহিলা এগিয়ে এলেন, লাবণী আহমেদের হাত ধরে বললেন, 'আসুন ভাই, আসুন। সেই ঢাকা থেকে গাড়ি করে আসছেন—গল্পগুজব পরে হবে, তার আগে বিশ্রাম। আসুন, আপনার জন্যে একটা কামরা আলাদা করা আছে। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিন।'

সংকোচ বোধ করছেন লাবণী আহমেদ। বললেন, 'না-না, অস্থির হবেন না। এত ক্লান্ত নই যে ঘুমুতে হবে। আপনি বোধহয়···।'

'হ্যাঁ, তুহিনের মা,' বললেন বৃদ্ধা, লাবণী আহমেদের হাত না ছেড়েই বাড়ির ভেতর ঢুকলেন। লাবণী আহমেদ লক্ষ করলেন, এ-বাড়ির কয়েকজন মেয়ে বা বউ লিলিকেও ঘিরে ধরেছে, আদর করে নিয়ে আসছে বাড়ির ভেতর। পুরুষরা কথা বলছে রায়হানের সঙ্গে, তাঁদের হাবভাব আর কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় এ-বাড়িতে তার কদর আছে।

ড্রইংরুমটা বিশাল, মেহমানদের সোফায় বসিয়ে ঠাণ্ডা সরবত খেতে দেয়া হলো। সরবত শেষ হতে না হতে ট্রেতে করে আনা হলো মিষ্টি আর নিমকি। বাড়ির কর্ত্রী লাবণী আহমেদের পাশে বসে বললেন, 'আসুন, আপনার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিই। আমার তিন মেয়ে, পাঁচ ছেলে।

তিন মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে, তারা ঢাকায় থাকে। আমরাও ঢাকায় থাকি, তবে বছরের এই সময়টায় প্রতি বছরই এখানে বেড়াতে আসা হয়। এবার তিন ছেলেকে আনতে পেরেছি, বাকি দু'ছেলের মধ্যে একজন বিদেশে, একজন রাজশাহীতে।' এক এক করে বড়, মেজো আর সেজো ছেলের সঙ্গে লাবণী আহমেদের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। তারা সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে সালাম করল। বিয়ে হয়েছে চার ছেলের, চার বউয়ের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। তারা লিলিকে ঘিরে কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে—তারাও কপালে হাত ঠেকিয়ে সালাম করল।

নাস্তার পালা শেষ হতে জানানো হলো, বাথরুমে গরম ও ঠাণ্ডা দু'রকম পানিই দেয়া হয়েছে, ক্লান্তি দূর করার জন্যে মেহমানরা গোসল করে নিতে পারেন। ইতিমধ্যে পাঁচটা বেজে গেছে, সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। লাবণী আহমেদ ঘুমাবেন না শুনে বাড়ির কর্ত্রী আসমা সিদ্দিকী বললেন, 'তাহলে চলুন, ছাদ থেকে খোলা হাওয়া খেয়ে আসি।'

গোসল করে ভাল লাগছে লিলির। বাথরুম থেকে বেরুতে দেখল, বাড়ির সব ক'টা বউ ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা নির্জন কামরায় নিয়ে আসা হলো তাকে, খাটের ওপর বসিয়ে চুল আঁচড়ে বিনুনি করে দিল মেজো ভাবী। এদের সবার আচার-ব্যবহার লক্ষ করে লিলির সন্দেহ হচ্ছে স্বপ্ন দেখছে কিনা। অদ্ভুত ব্যাপার, এখন পর্যন্ত ব্যক্তিগত একটা প্রশ্নও করা হয়নি ওকে।

খানিক পর ফ্যান ছেড়ে দিয়ে ঘর খালি করে চলে গেল সবাই, লিলি যাতে বিশ্রাম নিতে পারে। বালিশে মাথা দিয়ে শুলো বটে, কিন্তু দিনের বেলা ঘুমানোর অভ্যেস নেই ওর। ঘুরন্ত ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে কাল সকালের কথা ভাবল। সত্যি কি দেখা হবে তার সঙ্গে? রায়হান ভাই ভুল ঠিকানা যোগাড় করেননি তো? সত্যি ফিউরিকে ফিরে পাবে ও? ওর কাছে

ফিরতে রাজি হবে সে?

বিয়ের পর গত এক মাসের সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে লিলির।

রাত একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর মাকে টেলিফোন করে ও, কাঁদতে কাঁদতে জানায়, 'ফিউরিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।' এই একটা মাত্র কথা বলে রিসিভার রেখে দেয়। নতুন ফ্ল্যাটের ফোন নম্বর লাবণী আহমেদের জানা ছিল না, তিনি অস্থির হয়ে টেলিফোন করেন রায়হানকে। টেলিফোন পেয়ে ওপরতলায় লিলির কাছে যায়নি সে, গাড়ি নিয়ে সরাসরি লাবণী আহমেদের বাড়িতে চলে আসে। রায়হানের সঙ্গে মেয়ের কাছে চলে আসেন লাবণী আহমেদ।

সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর পুলিশকে খবর দেয়া হয়। একটু বেলা হতে লোক পাঠানো হয় ফিউরির গার্মেন্টস অফিসে। চারদিক থেকে শুধু দুঃসংবাদ আসার সেই শুরু। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি থেকে জানানো হয়, ফিউরি বলে তারা কাউকে চেনে না, ক'দিন আগে ফোন পাবার ঘটনাও অস্বীকার করা হয়। ফিউরির দেয়া চট্টগ্রাম আর সিলেটের নম্বরে টেলিফোন করেও একই ধরনের উত্তর পাওয়া গেল, ফিউরি বলে কাউকে তারা চেনে না—না, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়ে তাদেরকে কেউ কোনদিন ফোন করেনি।

দুপুরের পর মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরে এল লিলি। ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে, ফার্নিচারগুলো সবই ভাড়া করা, গহনাগুলো ইমিটেশন।

তিনটে দিন শুধু কাঁদল লিলি। লাবণী আহমেদও যেন বোবা হয়ে গেলেন। সাতদিন কাটল, তারপর অদ্ভুত এক চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হলো যেন নতুন এক লিলি। অফিসে এল সে, রায়হান চৌধুরীর সামনে দাঁড়িয়ে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'রায়হান ভাই, আপনি আমার ভাল চান?'

দাঁড়িয়ে পড়ল রায়হান। 'কি বলছ! অবশ্যই চাই।'

'তাহলে আমাকে সাহায্য করুন। জ্যান্ত একটা মানুষ, এভাবে বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না। হ্যাঁ, সবাই আপনারা তাকে প্রতারক বলছেন। বেশ, মেনে নিলাম। কিন্তু সে আমার স্বামী। তাকে আমি ভালবেসেছি। যেখানেই থাকুক সে, আমি তাকে খুঁজে বের করব। বলুন, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?'

প্রথমে সবাই লিলিকে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু লিলি কারও কথা শোনেনি। দেখা গেল, কেউ সাহায্য না করলে ফিউরির খোঁজে একাই বেরিয়ে পড়বে ও। মেয়ের আচরণ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন লাবণী আহমেদ। ভয় রায়হানও পেল। কাজেই বাধ্য হয়ে সব কথা খুলে বলতে হলো তার লিলিকে।

রায়হান লিলিকে জানাল, ফিউরি আসলে এর আগেও অনেকগুলো বিয়ে করেছে। বিয়ে করে ফুলশয্যার রাতে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর গহনা নিয়ে কেটে পড়া তার পেশা। একটা মেয়ের সঙ্গে সে ঘরও করে, তাদের একটা ছেলেও আছে। ফিউরির স্ত্রী এ বছর বি. এ. পাস করেছে। ফিউরিও শিক্ষিত ছেলে, প্রতারণাই তার পেশা। কেন সে প্রতারণার পথ বেছে নিল, কারণটাও ব্যাখ্যা করল সে। তানজিনের সেই গল্প। লিলি জানতে চাইল, এত কথা কোত্থেকে কিভাবে জানল রায়হান?

রায়হান বলল, 'কোত্থেকে জেনেছি তা বলা যাবে না, যে জানিয়েছে তার নিষেধ আছে।'

লিলি বলল, 'ঠিক আছে, মানলাম ফিউরি বিবাহিত, তার ছেলে আছে। কিন্তু তবু আমি তার কাছে যাব। তার সামনে আমাকে একবার দাঁড়াতেই হবে। আপনাদের কাউকে লাগবে না, আমি একাই যেতে পারব, আমাকে শুধু ঠিকানাটা দিন।'

আরও প্রায় দিন পনেরো পর লিলির জেদের কাছে হার মানতে বাধ্য হলো সবাই। পতেঙ্গার কাছাকাছি একটা বাড়িতে থাকে ফিউরি। তার স্ত্রীর নাম শিখা, একটা ফরওয়ার্ডিং এজেন্সিতে চাকরি করে। তার ছেলের নাম রনি, চার বছর বয়েস। কাল সকালে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে লিলি। চেষ্টা করবে স্বামীকে ফিরে পাবার।

রনিকে গোসল করিয়ে নাস্তা খাওয়াল শিখা। ছুটির দিন, স্কুল বা অফিসে যাবার তাড়া নেই, ফিউরিও বাজার থেকে ফেরেনি এখনও, বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ছেলেকে পড়তে বসার তাগাদা দিল। এই সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল।

বিছানা ছেড়ে দরজা খুলল শিখা। দু'কামরার ছোট্ট একতলা বাড়ি, দরজা খুললে রাস্তা দেখা যায়। সামনে সুশ্রী একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে ছাড়িয়ে শিখার দৃষ্টি চলে গেল রাস্তার ওপর। ওখানে একটা প্রাইভেট কারও দাঁড়িয়ে রয়েছে, গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছেন এক ভদ্রলোক, সঙ্গে একজন প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা—দু'জনেই এদিকে তাকিয়ে আছেন, তবে এগিয়ে আসছেন না।

আবার মেয়েটার দিকে তাকাল শিখা। 'কাকে চান?'

'এখানে ফিউরি বলে কেউ থাকে?' জানতে চাইল লিলি।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল শিখা। 'জ্বী, উনি বাজারে গেছেন, এখুনি এসে পড়বেন। আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?'

'ঢাকা থেকে। ফিউরি···আমি কি ভেতরে বসতে পারি?'

সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিল শিখা। 'হ্যাঁ, অবশ্যই···ওঁদেরকেও ডাকুন।'

ডাকল না লিলি, একাই ভেতরে ঢুকল। দরজাটা বন্ধ করল না শিখা,

একটা হাতল ভাঙা কাঠের চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

চেয়ারটায় বসে চারদিকে তাকাল লিলি। ফার্নিচার বলতে একটা চৌকি, একটা চেয়ার, একটা আলনা—আলনায় শুধু প্যান্ট-শার্ট আর লুঙ্গি-গামছা রয়েছে, মেয়েদের কোন কাপড় নেই। আরেক দরজা দিয়ে পাশের কামরায় যাওয়া যায়, সেখানেও একটা চৌকি দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে আরও একটা আলনা। ফিউরির সংসারের অবস্থা যে এরকম করুণ হতে পারে, কল্পনাও করেনি ও। তারপর ভাবল, একই বাড়িতে দুটো আলনা কেন?

'ঢাকা থেকে এসেছেন···আপনার নাম কি লিলি?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল শিখা।

অবাক হয়ে তাকাল লিলি। 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কিভাবে?'

'জানি। উনিই আমাকে বলেছেন,' বলে মেঝের ওপর বসে চৌকির ভেতর থেকে একটা স্যুটকেস টেনে বের করল শিখা। আঁচলে চাবির একটা গোছা বাঁধা রয়েছে, একটা চাবি দিয়ে স্যুটকেসের তালা খুলল সে। ভেতর থেকে ছোট তোয়ালে দিয়ে মোড়া একটা পোঁটলা বের করে বাড়িয়ে ধরল লিলির দিকে। 'এগুলো আপনার, নিন। ওঁকে আমি একটাও বিক্রি করতে দিইনি।'

'কি?' হাঁ করে তাকিয়ে আছে লিলি।

'আপনার বিয়ের গহনা,' বলে ঘুরে দাঁড়াল শিখা। 'আপনি বসুন, আমি চা বানাই।' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

পোঁটলাটা ধীরে ধীরে খুলল লিলি। বিয়েতে মার দেয়া সমস্ত গহনা যেন হেসে উঠল ওকে দেখে। ছেলেটা, রনি, হঠাৎ আব্বু আব্বু করে চিৎকার জুড়ে দেয়ায় চমকে উঠল ও। ঘাড় ফেরাতেই দেখল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ফিউরি। পরনে লুঙ্গি, হাতে বাজার ভর্তি

একটা পলিথিনের ব্যাগ।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল লিলি। বাজারের ব্যাগটা দরজার পাশে নামিয়ে রেখে মুখ তুলল ফিউরি। 'আম্মু বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমি কথা বলতে পারিনি···।'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল লিলি, 'মাকে আম্মু বলতে তোমার লজ্জা করে না? তুমি একটা ছোটলোক, আমাদের ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে কি সর্বনাশ করেছ জানো? তুমি···।' থরথর করে কাঁপছে সে, আর কিছু বলতে পারল না।

মাথা নিচু করল ফিউরি। একটা কথাও বলছে না।

তারপর কেঁদে ফেলল লিলি। 'কেন, ফিউরি? কেন?'

'আমি তোমার কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারব না,' মুখ না তুলেই বলল ফিউরি। 'জানি, আমার অপরাধের কোন সীমা নেই। আমি শুধু তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে পারি। যদি ক্ষমা করতে না পারো, যে-কোন শাস্তির কথা বলবে, আমি মেনে নেব। পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারো। লোক লাগিয়ে আমাকে মারতে পারো। এমনকি খুনও করতে পারো। আমি জানি, এ-সব শাস্তি আমার পাওনা হয়েছে।'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে শাস্তি দেব বলে আসিনি।' এগিয়ে এসে ফিউরির একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরল লিলি। 'যদি কোন অপরাধ করে থাকো, সে আমি অনেক আগেই ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি এসেছি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে, ফিউরি। তুমি আমাকে বিয়ে করেছ, আমি তোমাকে ভালবেসেছি!'

মুখ তুলে তাকাল ফিউরি।

'হ্যাঁ, ফিউরি। তুমি আমার সঙ্গে ঢাকায় ফিরে যাবে। হয় তুমি যাবে, নাহয় আমি এখানে থেকে যাব।'

ক্ষীণ, বিষণ্ণ হাসি ফুটল ফিউরির ঠোঁটে। 'তা সম্ভব নয়, লিলি।'

'কেন সম্ভব নয়? তোমার আরেকটা বউ আছে বলে? আছে থাকবে, আমি তো তার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করতে চাইছি না। সতীনের ঘর আমার আগেও হাজার হাজার মেয়ে করেছে, আমিও করতে পারব।'

'সতীন?' অবাক হয়ে তাকাল ফিউরি।

'সতীন?' জানতে চাইল শিখা, একটা ট্রেতে খান কতক বিস্কিট আর কয়েক কাপ চা নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। 'কাকে আপনি সতীন বলছেন?'

'কেন, তুমি···আপনি ওর কে?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

হেসে উঠল ওরা, ফিউরি আর শিখা একসঙ্গে।

তারপর শিখা বলল, 'ফিউরি ভাই আমাকে বিপদের সময় আশ্রয় দিয়েছেন। সে অনেক দুঃখের কাহিনী, বলতে সময় লাগবে। শুধু এটুকু বলি, ফিউরি ভাই সে-সময় আমাকে আশ্রয় না দিলে আজ আমি কোথায় থাকতাম জানি না। কতদিন হলো···চার বছর, পাঁচ বছর···।'

'আপনি বলতে চাইছেন, ফিউরি আপনার স্বামী নয়?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লিলি। 'আপনাদের বিয়ে হয়নি? তারমানে কি লিভ টুগেদার···?'

'না, তা-ও নয়। ফিউরি ভাই ওরকম অর্থে আমার কেউ নন,' চৌকির ওপর ধীরে ধীরে বসল শিখা। 'ভালবেসে এক ছেলেকে বিয়ে করেছিলাম, বাড়ি থেকে পালিয়ে। তিন মাস পর আমাকে দিয়ে ব্যবসা করাতে চাইল সে, আমি রাজি না হওয়ায় মারধর শুরু করল। একদিন ছুরি নিয়ে তাড়া করল, ভয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়লাম একটা মেসে। সেখানেই ফিউরি ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। পাড়ার ছেলেদের বলে তিনিই ভয় দেখান আমার স্বামীকে, এলাকা থেকে ভাগিয়ে দেন। আমার বাবা শিল্পপতি, আমাদের বাড়িতে দুটো গাড়ি, আমার ভাই-বোন সবাই

উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু আমার মা নেই—সৎ মার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যেই ভাল-মন্দ কিছু না ভেবে একটা ছেলের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু কপালে দুঃখ থাকলে···।'

'তারপর?'

'ওই মেসেই আমাকে থাকতে দেয়া হলো, রান্নাবান্নার কাজ করতাম। কিন্তু পাড়ার বখাটেরা বিরক্ত করতে শুরু করল। সারাদিন শুধু কাঁদতাম। এদিকে রনি আমার পেটে, কি করব বুঝতে পারছি না। আমার কান্না দেখে ফিউরি ভাই বললেন, অন্য পাড়ায় তিনি একটা বাড়ি ভাড়া করবেন, সেখানে থাকব আমি, মাঝে মধ্যে তিনি এসে দেখে যাবেন আমাকে। সেই শুরু, আজও ঠিক সেভাবেই চলছে। ফিউরি ভাইকে আর যে যাই মনে করুক, আমার কাছে উনি দেবতা। না, আপনাকে আমি ওঁর প্রশংসা করতে বলছি না। একা শুধু আপনার না, আরও অনেক মেয়ের জীবন নষ্ট করেছেন উনি। হ্যাঁ, আশ্চর্যই বটে যে কোথায় কখন কার সঙ্গে কি করেছেন সব আমি জানি, উনিই আমাকে বলেছেন। এই নোংরা জীবন থেকে সরে আসার জন্যে কম অনুরোধ করিনি আমি, কিন্তু আমার সে শক্তি কোথায় যে ওঁর ওপর অধিকার ফলাব? আমার তো শুধু ওঁর প্রশংসা করার কথা, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধন্য হবার কথা, ঋণী বলে ছোট হয়ে থাকার কথা। আমি ওঁর সমালোচনা করার কে?'

কামরার ভেতর শুধু শিখার কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'আমার এমনই দুর্ভাগ্য, এমনকি আমাকে ঋণ শোধ করার সুযোগও উনি দেবেন না,' আবার শুরু করল শিখা। 'পাঁচটা বছর আমাকে আর আমার ছেলেকে খাইয়েছেন পরিয়েছেন, আমার লেখাপড়ার খরচ যুগিয়েছেন। আজ আমি বি. এ. পাস করেছি, চাকরি পেয়েছি। বললাম, ফিউরি ভাই, এতদিন হয়ে গেল, এখনও তানজিনের কথা ভুলতে পারছেন

না? আমি জানি, তানজিনের ওপর রাগে অন্য মেয়ের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছেন উনি। এটা ওঁর একটা মানসিক রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বললাম, এভাবে একের পর এক মেয়েদের জীবন নষ্ট করে, নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। আমার জন্যে আপনি এত কিছু করলেন, এবার আপনার জন্যে আমাকে কিছু করতে দিন। আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে থাকেন, কোন জবাব দেন না। এবার ফিরে এসে যখন আপনার কথা বললেন, আমি সাংঘাতিক রাগ করেছি। এই প্রথম বলেছি, আপনি যদি এরকম করতে থাকেন, আপনার সঙ্গে আমি আর থাকব না।' শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছল শিখা। 'আপনি ভাই এসেছেন, সব দিক থেকে ভাল হয়েছে। আমি চাই, ফিউরি ভাই এবার শান্ত হোন। কিন্তু ওঁকে শান্ত করার ক্ষমতা বা অধিকার কোনটাই আমার নেই। আপনার দুটোই আছে, পারলে আপনিই পারবেন। যদি পারেন, আমার চেয়ে বেশি খুশি কেউ হবে না। একটা সোনার টুকরো এভাবে ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাবে, বলুন, একি চোখে দেখে সহ্য করা যায়?' কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ছেলেকে কোলে তুলে নিল সে। তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছে ফিউরি। শিখা যেন তার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা একটা বিস্ময়।

শিখা কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার পর কারও মুখে কোন কথা নেই। ফিউরিকে দেখে মনে হলো চিন্তিত। আর লিলি জানালার বাইরে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, নিলিপ্ত চেহারা মনের ভাব কিছুই ফাঁস করছে না।

মিনিট দশেক পর বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে লাবণী আহমেদ আর রায়হান চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলল লিলি। ওর জেদের কাছে হার মেনে ফিরে যেতে হলো তাঁদেরকে। ঠিক হলো, লিলিকে তাঁরা আবার বিকেলে নিতে আসবে।

বাড়িতে ফিরে রান্নাঘরে ঢুকল লিলি। শিখাকে বলল, 'তোমাকে ভাই কষ্ট দেব—রান্না করো, দুপুরে তোমাদের সঙ্গে খাব আমি।'

ম্লান হেসে শিখা বলল, 'কে কাকে খাওয়ায়, ভাই? এ তো তোমারই সংসার।'

'দাও, রনি আমার কাছে থাকুক,' বলে শিখার কোল থেকে রনিকে তুলে নিল লিলি।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, পিছন থেকে শিখা বলল, 'ফিউরি ভাইকে কোন কথাই বলতে দিয়ো না। ভয় দেখিয়ে হোক, বুঝিয়ে হোক, যেভাবে পারো নিয়ে যাও ওঁকে। এখন শুধু তুমিই পারো ওঁকে উদ্ধার করতে।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লিলি। কিছু বলতে গিয়েও কি ভেবে চুপ করে থাকল, নিঃশব্দে বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে।

চৌকির ওপর বসেছে ফিউরি, খররের কাগজের ওপর চোখ। লিলিকে ঢুকতে দেখে কাগজটা একপাশে সরিয়ে রাখল। স্টার ধরাল একটা।

রনিকে কোলে নিয়ে চেয়ারটায় বসল লিলি। কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলল না। তারপর লিলি শুরু করল, 'বুঝলাম, এটা তোমার পেশা। তা রাতটা কাটিয়ে এলে কি হত? আমি কি দেখতে এতই খারাপ? নাকি তুমি পুরুষত্বহীন?'

চৌকির ওপর কুঁকড়ে যেন এতটুকু হয়ে গেল ফিউরি।

লিলির শুধু চোখেই কান্না, গলার সুর সম্পূর্ণ শান্ত। 'তোমার সব কথাই আমি জানি, ফিউরি। কেন এসব করছ তাও বুঝি। কিন্তু সব মেয়েকে তানজিন মনে করছ কেন? আমি তো বলব, দোষ তোমারও কম ছিল না। তানজিনের মত একটা মেয়ের প্রেমে পড়া তোমার উচিতই হয়নি।' মনে মনে নিজকে তিরস্কার করল লিলি। প্রেম কি উচিত-

অনুচিতের ধার ধারে? তোর নিজের ব্যাপারটা চিন্তা কর। তুই কেন ফিউরিকে ভাল বাসলি?

ফিউরি চুপচাপ সিগারেট খাচ্ছে, লিলির দিকে তাকাচ্ছে না।

'আমার জানতে ইচ্ছে করে, এই যে তোমার জীবন, এতে কি তুমি সুখী? চুপ করে থেকো না, এ-সব প্রশ্নের জবাব আজ তোমাকে দিতেই হবে। এতগুলো মেয়েকে বিয়ে করেছ, রাত বোধহয় কারও সঙ্গেই কাটাওনি···জানো, কত বড় পাপ করেছ তুমি? আমি শুধু প্রতারণার কথা বলছি না। অপমানটার কথা বলছি। কোন মেয়ের নারীত্বকে এভাবে অপমান করা কিভাবে সম্ভব!'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ফিউরি। চোখ দুটো লাল হয়ে আছে।

'অথচ ওরা বলছে, তুমি নাকি শিক্ষিত।'

রান্নাঘর থেকে শব্দ ভেসে আসছে, কল ছেড়ে চাল ধুচ্ছে শিখা।

'আব্বু···,' বলে ফিউরির কাছে যাবার জন্যে হাত বাড়াল রনি। ছেড়ে দিল লিলি, মেঝেতে নেমে বিছানার দিকে এগোল রনি, তাকে কোলে তুলে নিল ফিউরি।

'রনি তোমাকে আব্বু বলে কেন?' জানতে চাইল লিলি।

সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল ফিউরি। 'জানি না। ওর মা ওকে কাকা বলাবার চেষ্টা করেছে, পারেনি। এর জন্যে মারধরও খেয়েছে ও। একদিন আমিই বলি, বলছে বলুক, মারধর কোরো না।'

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল লিলি, 'আমার জানতে ইচ্ছে করে, আমাকেও কি তোমার ওদের মত আরেকজন বলে মনে হয়েছিল? আর যাদেরকে বিয়ে করেছ? কোন পার্থক্য, কোন বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওনি?'

'এ-সব প্রসঙ্গ তুলে এখন আর কোন লাভ নেই, লিলি,' বলল ফিউরি, জানালার দিকে মুখ। 'উত্তরগুলো তোমার ভাল লাগবে না।'

'তবু আমি শুনতে চাই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ফিউরি, নিজেকে শক্ত করল, তারপর বলল, 'তানজিনকে ছাড়া কাউকে আমি ভালবাসিনি। না, তোমাকেও না।'

'দেখা যাচ্ছে সত্যি কথাও তুমি বলতে পারো।' লিলির ঠোঁটে ম্লান হাসি। 'বেশ, মানলাম, তানজিনকে ছাড়া তুমি কাউকে ভালবাসোনি। কিন্তু তোমাকে কেউ ভালবাসেনি? তোমার কাছে তার কোন মূল্য নেই?'

'না, নেই,' বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ফিউরি, হঠাৎই উপলব্ধি করতে পারছে এ-কথা বললে মিথ্যে বলা হবে। সে চুপ করে থাকল।

আরও খানিক পর, চুপচাপ বসে আছে ওরা, ট্রেতে করে দু'কাপ চা দিয়ে গেল শিখা। যাবার সময় ফিউরির কোল থেকে তুলে নিয়ে গেল ছেলেকে। কোন কথা হলো না।

'আজ যদি তানজিন তোমার কাছে ফিরে আসে, তুমি তাকে নেবে?' এক সময় হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করল লিলি।

'না।'

সামান্য হাসি ফুটল লিলির ঠোঁটে। 'জানতাম, এই উত্তরই দেবে। তোমার এ-কথার অর্থ কি, বোঝো? তারমানে এতদিন নিজেকেও ধোঁকা দিয়েছ। এমনকি তানজিনকেও তুমি ভালবাসোনি। কেউ যদি কাউকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসে, তাকে কোনদিন সে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। যেমন আমি, যেমন···।' কথাটা শেষ করল না লিলি।

ঝট করে লিলির দিকে তাকাল ফিউরি, কিন্তু ইতিমধ্যে আবার শুরু করেছে লিলি।

'তুমি কোনদিনই কাউকে ভালবাসতে পারোনি, বোধহয় আর তা পারবেও না,' বলল ও। 'কিন্তু তোমার এমনই কপাল, তুমি না চাইলেও

মেয়েরা তোমার প্রেমে পড়ছে। কাউকে ইচ্ছে করে, কাউকে না বুঝে বন্দী করছ। এখন দেখতে হবে কে তোমাকে বেশি ভালবাসে, কার দাবি বেশি জোরাল।'

লিলির দিকে তাকিয়ে আছে ফিউরি, চোখে পলক নেই।

'যতগুলো অন্যায় করেছ, সবই টাকা কামাবার অজুহাতে,' বলল লিলি। 'তোমাকে আগেই জানিয়েছি, আমার নামে ব্যাংকে পাঁচ-সাত লাখ টাকা আছে। মামা চিঠি লিখেছেন, তিনি আর দেশে কোনদিন ফিরবেন না। বাড়িটাও তিনি মাকে দান করে দিয়েছেন। যেহেতু আমি তোমার স্ত্রী, বাড়ি আর টাকা সবই একদিন তোমার হবে। তুমি জানো, চাকরি করছি কাজ শেখার জন্যে। আমার ইচ্ছে, নিজেই অফিস করব—এখান থেকে ফিরে গিয়েই।'

কিছুই বলছে না ফিউরি।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল লিলি, তারপর জানতে চাইল, 'এবার বলো, তুমি কি ভাবছ।'

'তা সম্ভব নয়, লিলি।'

'কি সম্ভব নয়?'

'আমাকে তোমার স্বামী হিসেবে পাওয়া হবে না।'

'কেন?'

'তোমাকে ছেড়ে যদি চলে না আসতাম তাহলে হয়তো সম্ভব ছিল, কিন্তু চলে আসার পর আজ আর তা সম্ভব নয়।'

একই প্রশ্ন আবার করল লিলি, 'কেন?'

ইতস্তত করছে ফিউরি, কি যেন বলতে চেয়েও পারছে না।

'কেন, ফিউরি? উত্তরটা আমাকে পেতেই হবে। আমি সুন্দরী নই, সেটাই কি কারণ?'

'একটা কথা মিথ্যে বলিনি তোমাকে—আমার চোখে তুমি সত্যি রানীর মত সুন্দর। তোমার ভেতরের রূপ আমি দেখেছি।'

'তাহলে? কেন তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ? সেগুনবাগিচার বাড়িটার ওপর তোমার লোভ হচ্ছে না? লোভ হচ্ছে না আমার টাকার ওপর? আমি যে তোমাকে এত ভালবাসি, এরও কোন গুরুত্ব নেই তোমার কাছে?'

ক্যামরার ভেতর অস্বস্তিকর নীরবতা।

'ফিউরি, জবাব দাও। উত্তরটা আমাকে পেতেই হবে।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ফিউরি, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'উত্তরটা, আমার ধারণা, তুমি জানো।'

ক্ষীণ, তিক্ত হাসি ফুটল লিলির ঠোঁটে। 'হ্যাঁ, এখানে আসার পর জেনেছি। কিন্তু তবু আমি তোমার মুখে শুনতে চাই, ফিউরি।'

লিলির দিকে সরাসরি তাকাল ফিউরি। 'তোমার কথাই ঠিক, লিলি। আজ বুঝতে পারি, তানজিনের প্রতি প্রথমে আমার যে আকর্ষণ আর তারপরে যে ঘৃণা ছিল, দুটোর কোনটার উৎসই ভালবাসা নয়। প্রথমে আমি সম্ভবত মোহে পড়েছিলাম, সেই মোহ কেটে যাওয়ায় স্বভাবতই আমাকে ঠকানো হয়েছে বলে একটা অনুভূতি হয়, তাকে ঘৃণা করার সেটাই বোধহয় কারণ। আর তোমাকে আমি···না, তোমাকেও আমি ভালবাসিনি। এমনকি তোমার প্রতি আমার কোন মোহও জন্মায়নি।'

'তারমানে কি বলতে চাও তুমি একটা অভাগা? কিভাবে ভালবাসতে হয় জানো না?'

'না, তা-ও নয়, লিলি,' বলল ফিউরি। 'ভাবতে গিয়ে এখন আমার অবাকই লাগছে। তানজিন বিদায় নেয়ার পর থেকে কি করছি আমি? চেষ্টা করছি ভালবাসা থেকে দূরে সরে থাকার, তাই না? অথচ দেখো, কি আশ্চর্য কাণ্ড, নিজেও জানি না কখন সেই ফাঁদেই আটকা পড়ে গেছি।'

'পরিষ্কার করে বলো।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল লিলি। বুঝতে পারছে, তার অনুমানই ঠিক হতে যাচ্ছে।

'ঢাকা, সিলেট, খুলনা কোথায় না গেছি আমি,' বলে চলেছে ফিউরি, 'কত মেয়ের সর্বনাশ করেছি। কিন্তু ঘুরে-ফিরে আবার তো সেই নির্দিষ্ট একটা ঠিকানায় ফিরে আসতে হয়েছে আমাকে। কেন বলো তো? বারবার কেন ফিরতে হয়? ও আমার কে···শিখা? কেউ তো না। তাহলে কেন এই বোঝা এতগুলো বছর মাথায় করে বয়ে বেড়াচ্ছি বলতে পারো? লোকে খারাপ বলবে, আইন বিরক্ত করবে, তাই বাড়িটা ভাড়া নেয়ার সময় বলা হয়েছিল আমরা স্বামী-স্ত্রী। যে মেয়ে আমার স্ত্রী নয়, নিজেকে তার স্বামী বলে পরিচয় দিতে, কই, আমার তো খারাপ লাগেনি। তার ছেলে আমাকে আব্বু বলে ডাকায়, কই, আমি তো রাগ করতে পারিনি।'

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর আবার ফিউরিই নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'শিখা আজ যা বলল, শুনে আমার চোখ খুলে গেছে। হঠাৎ করেই আবিষ্কার করেছি, এ তো আজকের ঘটনা নয়—ভাল ওকে আমি অনেক দিন আগে থেকেই বাসি···বোধহয় ওর ভালমন্দ আর নিরাপত্তার কথা ভেবে প্রথম যখন উদ্বেগ বোধ করি তখন থেকে।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে, বিড়বিড় করে বলল, 'ব্যাপারটা, আমার ধারণা, তুমিও আন্দাজ করতে পেরেছ, লিলি।'

ক্ষীণ, তিক্ত হাসি ফুটল লিলির ঠোঁটে। 'হ্যাঁ, এখানে আসার পর জেনেছি।' আবার একটা নিঃশ্বাস চাপল ও। 'না, এখনও তুমি অমানুষ হয়ে যাওনি, ফিউরি,' বলে উঠে দাঁড়াল।

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পর ঘরে ঢুকে লিলিকে দেখতে না পেয়ে শিখা জিজ্ঞেস করল, 'লিলি কোথায়?'

'সে চলে গেছে।'

'চলে গেছে? না খেয়ে? কেন?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল শিখা। 'ফিউরি ভাই, আপনি তাকে কি বলেছেন? কেন সে চলে গেল?'

ফিউরি কোন কথা বলল না।

'তার ঠিকানা জানেন? কোথায় উঠেছে বলেছে? আমি তার কাছে যাব···।'

নিজের পাশে চৌকিতে হাত রাখল ফিউরি। 'এখানটায় বসো, শিখা। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'না, এভাবে আপনি লিলিকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না। সে আপনাকে ভালবাসে···বলুন কোথায় উঠেছে সে···।'

'সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না, শিখা।'

'কি!' হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল শিখা। 'কেন, আপনি তাকে কি বলেছেন?'

'কিছুই বলিনি। সে নিজেই বুঝে নিয়েছে।'

'কি বুঝে নিয়েছে?'

'বুঝে নিয়েছে তার চেয়ে তোমার দাবি অনেক বেশি। সে আমাকে যতটুকু ভালবেসেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি তুমি ভালবেসেছ।'

কয়েক সেকেণ্ড স্থির পাথর হয়ে থাকল শিখা, তারপর এদিক ওদিক মাথা নাড়ল, সবশেষে কেঁদে ফেলল। 'না, মিথ্যে কথা! ভাল যদি সত্যি বাসতে পারতাম, আপনি আমার কথা শুনতেন। আপনাকে আমি কোনদিন কোন কথা শোনাতে পারিনি। না, মিথ্যে কথা। আপনাকে ভালবাসব, সে যোগ্যতা আমার কোন কালে ছিল না···কোন কালে হবেও না···।'

'আরেকবার চেষ্টা করে দেখো না, এখন থেকে আমি হয়তো তোমার সব কথাই শুনব।' তারপর হাতের মুঠো খুলল ফিউরি। 'এই দেখো,

তোমাকে কি দিয়ে গেছে লিলি।'

কান্না থেমে গেল শিখার, ফিউরির হাতে আড়াই ভরি ওজনের সোনার নেকলেসটা দেখে। 'মানে?'

'আমাদের বিয়েতে, মানে তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হও আর কি···।'

'চলে আসুন, রায়হান ভাই, আমি আছি,' বলে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল লিলি, হেলান দিল রিভলভিং চেয়ারে। ভাবতে আশ্চর্য লাগছে ওর, চট্টগ্রাম থেকে ফেরার পর তিন মাস পেরিয়ে গেল!

এক এক করে মনে পড়ে যাচ্ছে সব কথা। প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে উঠল স্নেহময়ী আসমা সিদ্দিকীর মুখটা। শুধু আসমা চৌধুরী নন, তাঁর বড় বউ টায়রা, মেজো বউ শামিনা, সেজো বউ তিন্নি, তারা সবাই লিলির মনে এমন গভীর দাগ কেটে দিয়েছে যে কোনদিন তা মুছবে না। মানুষ যে মানুষকে এত ভালবাসতে জানে, একটা পরিবারের সবাই যে এমন নির্মল আর নিরহংকার হতে পারে, ওদেরকে না দেখলে কারও মুখের কথায় কোনদিন বিশ্বাস করত না ও। একা শুধু ওকে নয়, ওর মাকেও জাদু করেছে।

ফিউরির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার দিনই ঢাকায় ফিরে আসতে চেয়েছিল লিলি, কিন্তু ওদের জেদ আর আদরের কাছে হার মেনে আরও তিন দিন ওখানে থাকতে হয়েছিল মা ও মেয়েকে। রায়হান অবশ্য পরদিনই ফিরে আসে, কারণ ঢাকায় অফিস ফেলে তার পক্ষে তিন দিন থাকা সম্ভব ছিল না। তিনটে দিন লিলিকে নিয়ে এমন মাতাই মেতেছিল পরিবারটি, ভাবতে বসলে এখনও অবিশ্বাস্য স্বপ্ন বলে মনে হয়। এখন ও কারও বউ নয়, এ-খবর দেয়ার পরও বাড়ির বউরা মানেনি, ওকে কনের

সাজিয়ে অসংখ্য ফটো তুলেছে। শুধু কনে সাজিয়ে নয়, নানা বিচিত্র সাজে সাজিয়ে বাড়ির ভেতর ও বাইরে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে দাঁড় করিয়ে ওর ছবি তোলা হয়নি। সেজো ভাবী, তিন্নি, বিউটিশিয়ান হিসেবে ট্রেনিং নিয়েছে, লিলির চুল কেটে ছোট করে দিল। রোজ দুপুরে ওকে নিয়ে পুকুরে নেমেছেন তারা, এমন কি গাছ আর পাহাড়েও চড়েছে। ওদের আদর ভালবাসার বহর দেখে বারবার ভাবতে বাধ্য হয়েছে লিলি, আমি ওদের কে? আমাকে নিয়ে ওরা এমন করছে কেন? তিনটে দিন যে কিভাবে কেটে গেল, টেরই পায়নি ও। বিদায় দেয়ার জন্যে বাড়ির সবাই তারা এয়ারপোর্টে এল। আসমা চৌধুরী ওকে চুমো খেয়ে বললেন, 'এখানে আমরা আর হয়তো মাসখানেক থাকব, তারপর আবার ফিরে যাব ঢাকায়। তোমার মাকে ঠিকানা দিয়েছি, তোমরা কিন্তু অবশ্যই আসবে।'

ঠিকানাটা মার কাছে আছে, আজও চাওয়া হয়নি লিলির। ওদের ঢাকার বাড়িতে যাবার কথা ভেবেছে বটে, কিন্তু সময় বের করতে পারেনি। ঢাকায় ফেরার পরপরই নিজের অফিস করার কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠে লিলি, গত তিনটে মাস এক দণ্ড সময় পায়নি দম ফেলার। মতিঝিলের এই অফিসটা পেতেই মাসখানেক লেগে যায়। দেড় মাস লাগল ডেকোরেশনের কাজ সারতে । টেলিফোন বসল, ফ্যাক্স মেশিন এল, স্টেশনারি জিনিসপত্র কেনা হলো, সাইনবোর্ড টাঙানো হলো, কাগজপত্র ছাপা হলো—কাজ কি একটা। ঘুষ না দিলে টেলিফোন বা ফ্যাক্স ছ'মাসেও পাওয়া যায় না, লিলিও পেত না—যদি না আড়াল থেকে কেউ সাহায্য করত ওকে। অবশেষে অফিসে বসার সুযোগ হয়েছে ওর, মাত্র এক হপ্তা আগে।

অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে রায়হান চৌধুরীকে নিজে গিয়ে দাওয়াত

দিয়ে এসেছিল লিলি। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল একটা কার্ড, শাহিনের জন্যে। ওর রায়হান ভাই কথা দিয়েছিল, কার্ডটা শাহিনকে পৌঁছে দেবে। পরে জেনেছে লিলি, কার্ডটা তাকে ঠিকই পৌঁছে দেয়া হয়। কিন্তু আসেনি সে। আসবে যে না, আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল ও। না আসায় দুঃখ পেয়েছে, তবে হতাশ হয়নি। মাত্র এক হপ্তা হয়েছে অফিস খুলেছে, এরইমধ্যে কোত্থেকে যেন গাদা গাদা কাজ এসে জমে যাচ্ছে টেবিলের ওপর, পাঁচ-সাতজন কর্মচারী থাকলেও সামলে উঠতে পারছে না লিলি। মনে মনে ভেবে রেখেছে, কাজ একটু কমলেই শাহিন সিদ্দিকীর ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবে ও, শেষ একটা চেষ্টা করে দেখবে। শুরু করবে আসমা সিদ্দিকীর বাড়ি গিয়ে। তাঁর এবং তাঁর সব ছেলের নামের শেষে সিদ্দিকী দেখেই একটা সন্দেহ হয়েছে লিলির মনে। ওর ধারণা, যাকে তুহিন বলা হয়েছে সে আসলে শাহিন। যে-কোন কারণেই হোক, শাহিন যে ওই পরিবারের ছেলে সেটা লিলির কাছে গোপন রাখা হয়। কেন? আসমা সিদ্দিকীর বাড়ি গিয়ে সেটাই জানার চেষ্টা করবে ও।

ইতিমধ্যে শিখার একটা চিঠি পেয়েছে লিলি। লিখেছে, ওর অফিসেই ফিউরির একটা ভাল চাকরি হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীতে সুখেই আছে তারা। কথা দিয়েছে, ঢাকায় কোনদিন বেড়াতে এলে অবশ্যই দেখা করবে।

চিঠিটার আজও কোন জবাব দেয়া হয়নি। তবে দেবে, কি লিখবে তা-ও ভেবে রেখেছে লিলি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিয়নকে ডাকল ও। 'রায়হান সাহেব আসছেন। উনি এলে দু'কাপ কফি দিয়ো।'

একটু পরই পৌঁছুল রায়হান চৌধুরী। হাতের কাজ শেষ করে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল লিলি। সে বসতেই জিজ্ঞেস করল, 'আগে বলুন আপনার ব্যবসা কেমন?'

হেসে ফেলল রায়হান। 'ব্যবসা তো ভালই চলছিল। ভাল চলছিল শাহিনের বদৌলতে। সে তার যত ইমপোর্টার বন্ধু আছে সবাইকে আমার কাছে ধরে আনছিল। কিন্তু…,' হঠাৎ থেমে গেল সে, চেহারায় ইতস্তত একটা ভাব।

'কিন্তু কি?'

'সে দুঃখ প্রকাশ করে আমাকে জানিয়েছে, অন্তত মাস ছয়েক কোন পার্টিকে আমার কাছে আনতে পারবে না।'

'কেন?'

'তার নাকি আরেকজনকে সাহায্য করতে হচ্ছে…নতুন অফিস করেছে বেচারি।'

সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল লিলির।

ওর চেহারা দেখে রায়হান তাড়াতাড়ি বলল, 'সেজন্যে অবশ্য আমার খুব যে অসুবিধে হচ্ছে, তা না। চট্টগ্রাম থেকে ফিরে পনেরো বিশ লাখ টাকার কাজ তো করেইছি…।'

'আপনার আর সব খবর কি বলুন, রায়হান ভাই।'

'খবর একটাই, লিলি। কাল আমার অফিসে শাহিন এসেছিল, এসেছিল একটা প্রস্তাব নিয়ে।'

'কি প্রস্তাব?'

কফি নিয়ে এল পিয়ন। সে চলে যেতে কাপে চুমুক দিয়ে রায়হান বলল, 'তার প্রস্তাব, আমি যেন তোমাকে বিয়ে করি।'

শক্ত কাঠ হয়ে গেল লিলি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, রায়হান চৌধুরীর মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর বিড় বিড় করে জানতে চাইল, 'আপনি কি বললেন তাকে?'

'ওর কথা শুনে হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না।' হাসছে রায়হান।

'বললাম, আরে গাধা, লিলিকে আমি ছোট বোনের মত দেখি···।'

ধীরে ধীরে ঢিল পড়ল লিলির পেশীতে।

রায়হান বলে চলেছে, 'আসলে, আমি তো জানি, শাহিন তোমাকে অসম্ভব ভালবাসে···।'

'ছাই ভালবাসে!' রাগে আর অভিমানে দপ করে জ্বলে উঠল লিলি। 'ভালবাসলে কেউ আরেকজনকে বিয়ে করতে বলে···?' বিস্ময়ে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রায়হান চৌধুরীর, লক্ষ করে থেমে গেল ও।

'তুমি জানো না, লিলি?' হাঁ করে তাকিয়ে আছে সে।

'কি জানব?'

'কেউ তোমাকে বলেনি? আশ্চর্য!'

ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ল লিলি। 'কি আশ্চর্য? কি বলবে?'

'মাসে দু'বার ডাইয়্যালাইসিস করাতে হয় ওকে, দূষিত রক্ত বের করে নতুন রক্ত ভরতে হয় শরীরে। অসুখটা একেবারে সেই ছোটবেলা থেকেই। আগে দু'তিন মাস পরপর রক্ত বদল করতে হত, মাঝখানে কিডনির অপারেশনও করা হয়েছে। অপারেশনটাই ছিল শেষ চিকিৎসা।' কাঁধ ঝাঁকাল রায়হান। 'আর ক'টা দিন, খুব বেশি হলে ছ'মাস, তারপর আর ডাইয়্যালাইসিসেও কাজ হবে না···।'

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে লিলির নাকের নিচে, ডেস্কের কিনারাটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে ও। 'কি বলছেন আপনি? খুব বেশি হলে ছ'মাস মানে···কিসের ছ'মাস?' নিঃশ্বাস ফেলতে যেন ভুলে গেছে ও।

'আয়ু, লিলি। ছেলেটা বাঁচবে না। সেজন্যেই তো তোমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে ও। কাল আমার ধমক খেয়ে কি বলল জানো? বলল, কোন ভাল একটা ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে না হলে মরেও নাকি শান্তি পাবে

না। আমি তো চিনি ওকে, তোমার প্রতি ওর টানটা বুঝতে পারি। কিন্তু কারও কিছু করার নেই। আশ্চর্য, এত বড় একটা খবর অথচ তুমি জানো না? আমি তো ধরে নিয়েছিলাম তুমি সবই জানো··· ।'

'রায়হান ভাই, সে এখন কোথায়?' কাঁপছে লিলি, ইচ্ছে করছে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে নিজেকে সামলে রাখছে ও। নিজেকে বোঝাচ্ছে, এখন তো অস্থির হলে চলবে না তোর! ধৈর্য ধর, মাথা ঠাণ্ডা রাখ। ভেবে দেখ কি করতে চাস। 'আমাকে আপনি একবার তার কাছে নিয়ে যেতে পারেন?'

'আজ তার তাইওয়ান যাবার কথা,' বলল রায়হান। 'এতক্ষণে বোধহয় চলেও গেছে। ফিরবে আগামী হপ্তায়। কিন্তু ফিরলেও যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হবে সে, আমার তা মনে হয় না··· ।'

হাত বাড়িয়ে খপ করে রায়হানের কব্জিটা চেপে ধরল লিলি। 'আপনি না বলেছেন, আমাকে ছোট বোনের মত ভালবাসেন? সত্যি যদি বাসেন, ঢাকায় ফিরে এলে একবার তাকে অবশ্যই আমার কাছে ধরে আনবেন। কথা দিন, রায়হান ভাই। বলুন, যেভাবে পারেন তাকে আপনি··· ।'

'ঠিক আছে, কথা দিলাম, চেষ্টা করব··· ।'

'চেষ্টা করব বললে হবে না,' প্রবল বেগে মাথা নাড়ল লিলি, তার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠেছে। 'কথা দিন, তাকে আপনি আমার কাছে আনবেনই··· ।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রায়হান বলল, 'ঠিক আছে, আনব। কিন্তু তাতে লাভ কি, লিলি?'

লাভ? লাভ কি তা লিলিও জানে না। শুধু জানে, শাহিনের সঙ্গে একবার তাকে বসতে হবে।

*

পরদিন সকালে অফিসে এসে স্টাফদের ডেকে লিলি বলল, আগামী দশ-বারো দিন কেউ যেন ওকে বিরক্ত না করে, অফিসের সব কাজ তাদেরকেই সামলাতে হবে। রায়হান চৌধুরী আর শাহিন সিদ্দিকী ছাড়া আর কারও সঙ্গে এই কদিন দেখাও করবে না ও।

সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ফ্যাক্স মেশিনের সামনে বসে থাকল লিলি। একটা করে ফ্যাক্স পাঠায়, আর অসীম ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। কোনটার উত্তর আসে সঙ্গে সঙ্গে, কোনটার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। প্রতিটি ফ্যাক্সই কানাডায় যাচ্ছে। দ্বিতীয় দিন রায়হানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলো লিলিকে, ওর অনুরোধে সে একবার আসমা চৌধুরীদের বাড়ি থেকে ঘুরে এল। পরের দিনটাও প্রায় বারো ঘণ্টা ফ্যাক্সের সামনে বসে কাটাতে হলো লিলিকে। হিসাব করলে জানতে পারত, এই তিন দিনে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার ফ্যাক্স বিল উঠেছে ওর।

তারপর শুরু হলো শাহিনের জন্যে অপেক্ষার পালা। একবার ভাবল শাহিন দেশে ফেরার আগেই আসমা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে আসে। তারপর ভাবল, না, এখুনি নয়। ওর মনের ইচ্ছে মনেই থাক, এখুনি কাউকে কিছু জানাবার দরকার নেই। এমন কি মাকেও কিছু বলল না লিলি।

ঠিক সাত দিন পর শাহিনকে নিয়ে ওর অফিসে হাজির হলো রায়হান। বসল না সে, শাহিনকে লিলির অফিস কামরায় ঢুকিয়ে দিয়েই বিদায় নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় শুধু বলল, 'ছোকরা আসতে চায়নি, জোর করে ধরে এনেছি। আমি কিছু জানাইনি ওকে।'

দাঁড়িয়ে আছে শাহিন, আজ তাকে অন্য দিনের চেয়ে একটু যেন ম্লান দেখাচ্ছে। শীতের শুরু, অ্যাশ কালারের স্যুট আর নীল ডোরাকাটা টাইয়ে

দারুণ মানিয়েছে তাকে। তাকিয়ে আছে সরাসরি লিলির দিকে, চোখের তারায় একটু যেন কৌতুকের ভাব ঝিলিক দিচ্ছে।

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল লিলি, ডেস্ক ঘুরে নিজের রিভলভিং চেয়ারটায় বসে হাতব্যাগের ভেতর ভরল চাবিটা, তারপর হেলান দিয়ে শাহিনের দিকে তাকাল। 'দাঁড়িয়ে কেন, বসো।'

এমন চোখে তাকাল শাহিন, যেন খুব অবাক হয়েছে। হবারই কথা, কারণ এতদিন লিলি তাকে সব সময় 'আপনি' বলে সম্বোধন করে এসেছে। আজ 'তুমি' বলছে কেন? ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসল সে। 'তুমি আমাকে ডেকেছ কেন?'

'কয়েকটা কথা জানার আছে, তাই,' নরম সুরে বলল লিলি। 'আশা করি তুমি সত্যি কথা বলবে।'

সাবধানে তাকাল শাহিন। 'কি কথা?'

'তুমি নাকি রায়হান ভাইকে বলেছ আমাকে যেন তিনি বিয়ে করেন?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল শাহিন। 'না···মানে···হ্যাঁ···।'

'কেন বলেছ?' স্পষ্টকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লিলি, গলার স্বর আগের মত নরম নয়।

চুপ করে থাকল শাহিন। মনে মনে ভাবছে—সর্বনাশ! এ আবার কি বিপদে পড়লাম! তারপর বলল, 'তাঁর সম্পর্কে যার যে ধারণাই থাকুক, আমি তো জানি—উনি খুব ভাল মানুষ।'

'এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না,' বলল লিলি। 'রায়হান ভাই ভাল মানুষ, আমার জন্যে এটা কোন নতুন খবর নয়। আমি জানতে চাইছি, আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাটা তোমার মাথায় ঢুকল কেন?'

এবারও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল শাহিন। ভাবছে—তোমার এ-প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়, লিলি। মুখে বলল, 'আমি তোমার ভাল চেয়েছি,

তাই।'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে লিলি জানতে চাইল, 'তুমি আমার ভাল চাওয়ার কে?'

হকচকিয়ে গেল শাহিন। বড় বড় চোখ তুলে বোকার মত তাকিয়ে থাকল লিলির দিকে। তার হাতের তালু ঘেমে যাচ্ছে।

'জবাব দাও।'

শাহিন ভাবছে, আমিই তো তোমার ভাল চাইব, লিলি। কিন্তু কেন ভাল চাইব তা তোমাকে কোনদিনই জানানো হবে না।

'আমার আরও অনেক প্রশ্ন আছে, সবগুলোর জবাব না দিয়ে এখান থেকে তুমি উঠতে পারবে না। গত সাত-আট বছর ধরে তুমি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে আসছ। কেন, কি কারণ?'

মাথাটা নিচু করল শাহিন। 'বললাম তো, আমি তোমার ভাল চেয়েছি···।'

'সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি, কেন চেয়েছ? আমি দুর্বল বলে? দুর্বল মেয়ে তো এ শহরে কয়েক লাখ, তুমি কি তাদেরও সাহায্য করেছ, নাকি শুধু একা আমাকে?'

'না···হ্যাঁ···।' শাহিন ভাবছে, আর কোন মেয়ে এ শহরে আছে নাকি? যদি থাকেও, আমার তা জানা নেই, কারণ কেউ তারা আমাকে চড় মারেনি। সেই যে মার খেলাম, তারপর আর আমি কোন মেয়ের দিকে তাকাইনি।

'তাহলে বলো, এত মেয়ে থাকতে একা শুধু আমাকে কেন?'

শাহিন বলল, 'বুঝতে পারছি, সাংঘাতিক অপরাধ হয়ে গেছে আমার। সেজন্যে আমি ক্ষমা চাই।'

'ক্ষমার প্রশ্ন পরে। আগে আমাকে কারণটা বুঝতে হবে—এই অপরাধ তুমি করলে কেন?'

দুঃখিত, লিলি; কারণটা তোমাকে বলা যাবে না।

'চুপ করে থাকলে কোন লাভ হবে না। উত্তর আমাকে পেতেই হবে। আমি দুর্বল, সেজন্যে আমাকে করুণা করেছ? নাকি আমাকে একটা খেলনা পুতুল ধরে নিয়েছিলে—ভেবেছিলে যখন ইচ্ছে পিছনে লাগা যায়, আবার যখন ইচ্ছে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায়?'

'না।' চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল শাহিনের।

'তাহলে কি?'

'আমি এখন যেতে চাই,' বলল শাহিন। 'যদি পারো, ক্ষমা করে দিয়ো।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'চাবি আমার কাছে, তোমার যাবার রাস্তা বন্ধ। আমার কথার জবাব না দিয়ে তুমি যেতে পারবে না।'

শাহিন এবার স্পষ্ট করে বলল, 'দুঃখিত, তোমার কোন প্রশ্নেরই জবাব দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লিলি, তারপর বলল, 'আমি খুব জেদি মেয়ে, শাহিন। কেউ আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, আর আমি তা চুপচাপ মেনে নেব, তা ভেব না। আমি জানতে চাই, আমাকে এভাবে অপমান করার অধিকার তোমাকে কে দিল?'

'আমি তোমাকে অপমান করেছি?'

'করোনি? তাহলে শোনো, এক এক করে বলি। আমার ভুল ভাঙানোর নাম করে কয়েকটা বছর পিছনে লেগে থাকলে, তারপর যে-ই আমি তোমার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলাম অমনি তুমি দূরে সরে গেলে—এত দূরে, চেষ্টা করেও নাগাল পাই না। একটা মেয়ের জন্যে এরচেয়ে অপমান আর কি হতে পারে? আমার মধ্যে একটা অভিমান জাগল—লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট-কে সত্যিকার ভালবাসা বলে না, এ জানা সত্ত্বেও ফিউরির

ফাঁদে পা দিলাম আমি। তারপর কি ঘটল? ফিউরি সম্পর্কে জানার জন্যে চট্টগ্রামে গেলে তুমি, ফিরে এলে সে বিবাহিত এই খবর নিয়ে। কিন্তু কথাটা তুমি সরাসরি আমাকে না বলে বললে রায়হান ভাইকে। শুধু তাই নয়, তাঁকে তুমি পরামর্শ দিলে তিনি যেন ফোন করে ফিউরিকে জানান যে বিয়ে করাটা যে তার ব্যবসা তা ফাঁস হয়ে গেছে। রায়হান ভাইয়ের ফোন পেয়ে পালিয়ে গেল ফিউরি—ফুলশয্যার রাতে। একটা মেয়ের সঙ্গে এরচেয়ে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা সম্ভব? এরচেয়ে বড় অপমান আর কিছু হতে পারে? আবার ক'দিন আগে রায়হান ভাইকে ধরেছ, তিনি যেন আমাকে বিয়ে করেন। তোমার ভাবটা এমন, যেন আমার নিয়তি নির্ধারণ করে দিতে চাও। কোন অধিকারে, শাহিন? কে তোমাকে আমার ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার দিল?'

ঘেমে গোসল হয়ে গেছে শাহিন, পকেটে হাত ভরে সিগারেট আর লাইটার বের করল।

হাত বাড়াল লিলি। সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার, দুটোই কেড়ে নিল শাহিনের হাত থেকে। 'তোমার সিগারেট খাওয়া নিষেধ।' হাত তুলে টয়লেটের দরজাটা দেখাল। 'ঘেমে গেছ দেখছি, ইচ্ছে করলে মুখটা ধুয়ে আসতে পারো—নতুন সাবান তোয়ালে সবই আছে।'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল শাহিন। টয়লেটের দরজা বন্ধ করে বেসিনের কল ছাড়ল। কলের পানিতে মুখ ধোবে কি, চোখের পানিতেই ভিজে যাচ্ছে সেটা। অদম্য একটা কান্না এসে কাঁপিয়ে দিল তাকে। আহত পশুর মত ফোঁপাতে শুরু করল সে।

টয়লেট থেকে শাহিনের বেরুতে দেরি হচ্ছে দেখে নার্ভাস লাগছে লিলির। ইতিমধ্যে দু'বার চেয়ার ছেড়ে উঠেও আবার বসে পড়েছে। বারো-তেরো মিনিট পার হয়ে গেছে, এখনও বেরুচ্ছে না কেন সে?

আরও দু'মিনিট কাটল। চেয়ার ছেড়ে আবার দাঁড়াল লিলি। এই সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এল শাহিন, তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে। লিলি দেখল, চোখ দুটো তার আগের চেয়েও লাল হয়ে আছে। 'কিছু আনতে বলব?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল ও। 'কিছু খাবে?'

মাথা নাড়ল শাহিন, তোয়ালেটা চেয়ারের পিঠে রেখে বলল, 'দরজাটা খুলে দাও, প্লীজ।'

'তারমানে তুমি আমার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেবে না?' এখন আর লিলির গলায় কোন ঝাঁঝ নেই, চেহারাটাও সম্পূর্ণ শান্ত।

'সত্যি দুঃখিত,' বিড়বিড় করল শাহিন। 'আমার শুধু একটা কথাই বলার আছে। তোমার প্রতি মস্ত অন্যায় করেছি। জানি, এ অপরাধের ক্ষমা হয় না···।'

'বারবার অপরাধ করেছ বলছ কেন? তুমি তো সব সময় আমার ভাল চেয়েছ। কারণটা বলছ না। না বললেও, আমি জানি। তুমি কেন বলছ না, তা-ও আমি জানি, শাহিন।'

'কি জানো তুমি?'

'জানলেও,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল লিলি, 'চেয়েছিলাম তোমার মুখ থেকে শুনব। কেন চেয়েছি জানো? সব মেয়েই তাই চায়। আমি তো অতি সাধারণ একটা মেয়ে, শাহিন। কেউ যদি আমাকে চায়, ভাবতে ইচ্ছে করে সে-ই কথাটা মুখ ফুটে আমাকে বলবে। মেয়েদের এ এক ধরনের আবদার বলতে পারো—যারা ভাগ্যবতী, এ আবদার শুধু তাদের পূরণ হয়।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিলি। 'একটু দেরিতে বুঝলাম, আমারটা পূরণ হবার নয়।' হাতব্যাগ থেকে চাবি বের করে ডেস্কের ওপর রাখল ও। 'এই নাও, শাহিন, তুমি যেতে পারো।'

ডেস্ক থেকে চাবিটা তুলে নিয়ে দরজার তালা খুলল শাহিন। দেরাজ

থেকে মোটা একটা এনভেলাপ বের করল লিলি, মুখ তুলে তাকাল। আবার ডেস্কের দিকে এগিয়ে এল শাহিন, চাবিটা রেখে বলল, 'আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না···।'

লিলি তা জানে। রায়হান চৌধুরীর মুখ থেকে শুনেছে ও। সিদ্দিকী পরিবার তাঁদের কনিষ্ঠ সন্তানকে নিয়ে চট্টগ্রামে চলে যাচ্ছেন, আগামী ছ'মাস তাঁরা ওখানেই থাকবেন সবাই। শহরের কোলাহল থেকে দূরে, বন-জঙ্গল ঢাকা পাহাড়ি পরিবেশে, অঢেল স্নেহ-মমতা আর আদর-যত্নে শাহিন সিদ্দিকীর আপনজনেরা তার মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করবেন। সন্দেহ নেই, সবাই তাঁরা হাল ছেড়ে দিয়েছেন। শাহিন সিদ্দিকীর অকাল মৃত্যুকে নিয়তির অমোঘ বিধান বলে মেনে নিয়েছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল লিলি। এনভেলাপটা বাড়িয়ে দিল শাহিনের দিকে। 'এটা নিয়ে যাও। বাড়িতে গিয়ে পড়ে দেখো।'

হাত বাড়িয়ে এনভেলাপটা নিল শাহিন। সে খুব অবাক হয়েছে। জানতে চাইল, 'কি আছে এতে?' মুখ খোলা এনভেলাপ, ভেতরে অনেক কাগজ-পত্র। নাড়াচাড়া করতে গিয়ে সব বেরিয়ে এল।

ওখানে দাঁড়িয়েই কাগজগুলো আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল শাহিন। তারপর মুখ তুলে বিস্মিত গলায় বলল, 'এ-সব তো আমার প্রেসক্রিপশন, আমার রোগের বিবরণ···তুমি কোত্থেকে পেলে?'

'ওগুলো ছাড়াও তো আরও কাগজ-পত্র রয়েছে, বাড়িতে গিয়ে পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে···।'

'কিন্তু···তারমানে···তুমি আমার অসুখের কথা জানো তাহলে?' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল শাহিন।

'জানি,' বলল লিলি। 'মাসে দু'বার তোমাকে ডাইয়্যালাইসিস করাতে হয়। তোমার আর আয়ু আছে খুব বেশি হলে ছ'মাস।'

বাকি কাগজগুলো দেখার সময় হাত দুটো কাঁপছে শাহিনের। নিজের অজান্তেই এক পা এগিয়ে আবার বসে পড়ল সে। আরও প্রায় পনেরো মিনিট পর মুখ তুলল। 'কিডনি বিশেষজ্ঞ ফাতেমা কবির, ক্যানসার বিশেষজ্ঞ কবির আনোয়ার···এঁরা কে?'

'আমার মামা-মামী।'

'এখানে ওঁরা বলছেন, কানাডায় নতুন একটা চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে···।'

'হ্যাঁ।'

'ব-বলছেন···।' থরথর করে কাঁপছে শাহিন, কথা বলতে গিয়ে তোতলাচ্ছে।

'কি বলছেন সে-সব পরে চিন্তা করে দেখো,' বলল লিলি। 'আরও তো কাগজ রয়েছে, বাড়িতে গিয়ে পড়ে দেখো···।'

'আরও কাগজ···,' ঘাঁটাঘাঁটি করে সত্যি আরও একটা ভাঁজ করা কাগজ পেল শাহিন। এটা কোন ফ্যাক্স কপি নয়, হাতে লেখা চিঠি। লিলির হাতের লেখা তার চেনা, সে-ই লিখেছে চিঠিটা। মাত্র কয়েকটা লাইন, এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল শাহিন।

'প্রিয় শাহিন,

আমার ইচ্ছে, এই চিঠি যেদিন তুমি পাবে তার পরদিনই আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক। তোমার তো পাসপোর্ট আছেই, আমার পাসপোর্টও হয়ে গেছে, ভিসাও কোন সমস্যা নয়—আমি চাই বিয়ের দিন পনেরোর মধ্যেই কানাডায় চলে যাব আমরা। আমাকে বিয়ে করতে না চাওয়ার কোন কারণ তুমি দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না,

তবু যদি একান্তই না চা-ও, তোমার কাছে আমার শুধু একটাই মিনতি—যাবার সময় আমাকেও তুমি কানাডায় নিয়ে যাবে, তোমার দেখাশোনার জন্যে ওখানে তো একজনকে থাকতেই হবে। আমাকে তুমি অনেক কষ্ট দিয়েছ, আশা করব অন্তত এই শেষ অনুরোধটা রাখবে।

তোমার, লিলি।'

পড়া শেষ হতে চিঠিটা মুঠোর ভেতর দলা পাকিয়ে ফেলল শাহিন। 'এ হয় না, লিলি! না!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে।

'কেন হয় না?'

'ওঁরা বলেছেন, ফিফটি-ফিফটি চান্স···।'

'ওঁরা কোন আশ্বাস না দিলেও আমার সিদ্ধান্ত এই একই থাকত, শাহিন,' বলল লিলি। 'ভেবে দেখো না, মানুষের জীবনে মৃত্যুটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক ঘটনা নয়? ধরো এক ছেলেকে আমি ভালবাসি, আমার বা তার কোন অসুখ নেই—আমাদের বিয়ে হলো, পরদিন হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলাম আমি। এরকম ঘটতে পারে না? ঘটে না? সবাই আমরা জানি, ঘটে, ঘটতে পারে। কিন্তু তাই বলে কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকি কেউ?'

মাথা নিচু করে বসে আছে শাহিন। আবার ঘামতে শুরু করেছে সে।

'ছ'মাস কেন, আমার কাছে ছ'মিনিটও মহামূল্যবান, শাহিন,' বলে চলেছে লিলি। 'যদি মনে করো তোমাকে করুণা করতে চাইছি, তাহলে ভুল করবে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি আমার নিজের স্বার্থটাকেই বড় করে দেখছি। তোমাকে বিয়ে করতে চাওয়ার সেটাই কারণ। তুমিই বলো, আমি সুখী হতে চাইব না কেন? ফিফটি-ফিফটি চান্স গুলি মারো। আমার কাছে ওই ছ'মাসই পুরো একটা জীবন।'

কথা বলতে গিয়ে পারল না শাহিন, ডাঙায় তোলা মাছের মত খ

খেলো শুধু। তার চোখ বেয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল লিলি, শাহিনের পাশে চলে এসে তার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'কাল আমাদের বিয়ে,' তার কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিস করল। মনে মনে নিজেকে প্ররোচনা দিচ্ছে—ওকে আদর কর, চুমো খা, জড়িয়ে ধর। এ-সব ওর পাওনা হয়েছে বলে নয়, ওর মনে এখনও যদি কোন দ্বিধা থাকে সেটা দূর করার জন্যেই এখন তোকে একটু নির্লজ্জ হতে হবে। তবে এসব কিছু না করে শাহিনের মুখে হাত বুলাতে শুরু করল। বলল, 'আমি অন্ধ হয়ে গেছি, শাহিন। এ তোমার সাত-আট বছরের সাধনার ফসল। আমি শুধু আমার ভালবাসাকে দেখতে আর স্পর্শ করতে পারছি।'

ডেস্কে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল শাহিন। তারপর অনুভব করল, লিলির আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছে সে। তার মাথাটা বুকে চেপে ধরে নিজেকে সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে লিলি।

বিয়ের একুশ দিন পর মন্ট্রিয়ল এয়ারপোর্টে লিলির মামা-মামী ওদেরকে নিতে এলেন। আরও ছ'মাস পর লাবণী আহমেদকে টেলিফোন করল লিলি। মেয়ের সঙ্গে কথা বলার পর আসমা সিদ্দিকীকে টেলিফোন করলেন লাবণী আহমেদ। বেয়ানকে তিনি একটা সুখবর দিলেন, 'আপনার বৌমা তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা···।'

- 0 -

সেবা রোমান্টিক

মধুযামিনী

শেখ আব্দুল হাকিম

এমন মেয়েও আছে, এই যেমন লিলি,
ভালবাসা শুধু দিতেই জানে, নিতে জানে না।
এমন ছেলেও আছে, যেমন ফিউরি,
জড় সুদ্ধ ভালবাসা উপড়ে ফেলতে চায়,
অথচ জানে না কখন নিজেই পুঁতে বসে আছে প্রেমের চারা।
আর আছে ভালবাসার কাঙাল, যেমন রায়হান,
সুখ কেনাবেচার হাটে শুধু লোকসান দিয়েই মরে।
আর আছে পাগলামি ও মহানুভবতায়
ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, যেমন শাহিন-
সবাইকে খুশি করতে চেয়ে নিজের জন্য
গরল সংগ্রহ করাই যার নিয়তি।

সেবা প্রকাশনা